অমৃতের পুত্র-কন্যা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

এই লেখকের অন্যান্য বই

মানুষটির জ্ঞান ফিরে এলো ব্রাহ্ম মুহূর্তে। আকাশে এখন হাল্‌কা জল-রং আলো, কিছু কিছু অন্ধকার এদিকে ওদিকে ওড়াউড়ি করছে, একদিকে নব-অনুরাগের মতন চাপা রক্তিম আভা দেখা দিয়েছে সবেমাত্র।

লোকটি চোখ মেলে এসব কিছুই দেখলো না। যেন চোখ চাওয়াটাই বড় কথা, দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। আকাশে যেমন একটু একটু করে রং ফিরছে, তার চোখেও সেইরকম একটু একটু করে প্রাণ আসছে। ক্রমে তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে এলো একটা হাঁস, দুধের মতন ধপধপে সাদা ডানা, শরীরের তুলনায় অনেক বড়। তারপর আর একটি, আর একটি। তিনটি হাঁস তার মাথার ওপর এক চক্কর ঘুরে চলে গেল, মানুষটি তার চোখ দিয়ে ওদের অনুসরণ করলো না।

একটু পরে জল থেকে লাফ দিয়ে উঠলো সূর্যের লাল মাথা, যে-রকম লাল শুধু এই ভোরবেলার আকাশ ছাড়া আর কোনো সময়েই দেখা যায় না। তাপহীন, কোমল, ঈশ্বরের হৃৎপিণ্ডের মতন। মহাকালের আঁকা একটি মহা-জাগতিক কুসুম।

মানুষটি এবার ব্যস্তভাবে উঠে বসলো। এমন প্রগাঢ় বিস্ময়ের সঙ্গে সে সূর্যের দিকে তাকালো যেন জীবনে এই প্রথম সে ঊষা দেখছে।

তারপর সে নিজেকে দেখলো।

তার পরনে একটি বোতল-সবুজ রঙের ট্রাউজার্স, আর কোনো পোষাক নেই। ট্রাউজার্সও তিন চতুর্থাংশ মাপের, অর্থাৎ গোড়ালি ও হাঁটুর মাঝামাঝি শেষ। তার বুক বেশ রোমশ, মুখে গোঁফ-দাড়ি নেই, সবল শরীর, তিরিশের কাছাকাছি বয়েস।

বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে গেল তার। তার কোনো স্মৃতি নেই। কেন তার স্মৃতি নেই সে কথাটাই সে মনে করবার চেষ্টা করছে। কেন এমন খোলা আকাশের নিচে বালির ওপর শুয়ে থাকা অবস্থায় তার ঘুম ভাঙলো তা সে জানে না। এতক্ষণ খেয়াল করেনি, এবার তার কানে এলো সমুদ্রের ঢেউ-এর শব্দ। বালির ওপরে সে যেখানে বসে আছে, তার খুব কাছেই একটার পর একটা ঢেউ এসে বালি চেটে যাচ্ছে। তবে, ঢেউগুলি তেমন জোরালো নয়।

একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে শুধু বালি। কয়েকটি সিন্ধু সারস ছাড়া আর কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই। মানুষটি কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলো। সে তার মনের গভীরে ডুব মেরে কিছু একটা তুলে আনবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কিছুই পাচ্ছে না। সে তার নিজের নামও জানে না। অথচ সে এইটুকু বুঝতে পারছে যে তার নাম তো ছিল বটেই, গতকাল পর্যন্ত তার অন্যরকম জীবনও ছিল নিশ্চয়ই। সে এই বালুকাময় জায়গাটিতে সদ্য আগন্তুক।

খানিকবাদেই বৃষ্টি নামলো। খুব পাতলা, ঝিরিঝিরি বর্ষণ। একটু আগেও কিন্তু এখানকার আকাশে সেরকম মেঘ ছিল না। সে স্বভাবতই উঠে দাঁড়ালো। খানিকটা হাঁটবার পর সে বুঝতে পারলো, জায়গাটা সমতল নয়, দিগন্তের দিকটা ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠছে। এবারে ছুটতে শুরু করলো সে, সম্ভবত সে জানতে চায় দিগন্তের ওপারে কী আছে।

বৃষ্টি আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে, তবু মানুষটি ছুটছে। বেশ খানিকটা দূরে সে কয়েকটি কালো কালো মূর্তি দেখতে পেয়েছে। যেন চারপাঁচজন মানুষ গল্প জুড়েছে গোল হয়ে বসে। সে চিন্তা করলো না, ঐ মানুষগুলো তার বন্ধু না শত্রু হবে। সে যে-কোনো মানুষের সঙ্গ চায়।

অবশ্য ওগুলো মানুষ নয়, কয়েকটি বড় বড় পাথর। সেখানে কিছু গাছের গুঁড়িও পড়ে আছে। আর একটা জীবন্ত লম্বা গাছ। তার পাতাগুলো গোল গোল। এখান থেকে ঢালু হয়ে গেছে ভূমি, আবার দেখা যায় সমুদ্র। অর্থাৎ মানুষটি দ্বীপের আরেক প্রান্তে এসেছে। এদিককার বেলা ভূমিতে বালির বদলে চূর্ণ পাথর ছড়ানো।

এখানে দাঁড়ালে বাঁ দিকে ছোট পাহাড় দেখতে পাওয়া যায়। একটা নয়, পর পর কয়েকটা। মানুষটি এবারে ছুটলো সেদিকে। তার ছোটার মধ্যে একটা ব্যাকুলতা আছে, যেন সে ওখানে কিছু পাবেই।

প্রথম পাহাড়টি বেশ ছোট, একটা টিপিই বলা যায়। মানুষটি তরতর করে উঠে গেল তার ওপরে। এবারে সে অনেক দূর দেখতে পাবে। কিন্তু সেখানে উঠতেই আবার বৃষ্টি এসে গেল। এবার বেশ জোরে। তার মধ্যেই মানুষটি দেখতে পেল তিন দিকে সমুদ্র, আর একদিকে কয়েকটি পাহাড়, তাদের উপত্যকায় বেশ গভীর বন।

সে টিলা থেকে নেমে জঙ্গলের দিকে গেল। তার মধ্যেই আবার বৃষ্টি থেমে গেছে। দেখা যাচ্ছে। এখানকার বৃষ্টি খুব খেয়ালি, যখন তখন আসে, যখন তখন চলে যায়।

জঙ্গলটি শুরু থেকেই নিবিড়। গাছগুলি খুব বড় নয়, দু-মানুষ, আড়াই-মানুষ উঁচু, কিন্তু ডালপালা অনেক আর খুব ঘন পাতা। তাই অন্ধকার-অন্ধকার।

মানুষটি বনের মধ্যে খানিকটা ঢুকে থমকে গেল। তার শরীরের রোমগুলি উত্তেজিত হয়েছে। হাওয়ায় শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে জঙ্গলের ভেতরটায়, সামনের দিকে বেশী দূর দেখা যায় না, কেমন যেন থমথমে হয়ে আছে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে অপেক্ষা করলো কিছুক্ষণ।

তারপর পিছু হটে হটে সে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলো।

প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ বছর আগে সে জঙ্গল ছেড়ে বাইরে চলে এসেছিল, তারপর থেকে সে আর সহসা কোনো অচেনা জঙ্গলে একা ঢুকতে চায় না।

একেবারে প্রান্তসীমার একটি গাছ থেকে একটি ডাল ভেঙে নিল সে। পাতা ও প্রশাখাগুলো ছিঁড়ে একটি লাঠি বানিয়ে ফেলল। তারপর সেটা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে সে চিন্তিতভাবে চেয়ে রইলো জঙ্গলের দিকে। তিন দিকে সমুদ্র, শুধু এক দিকের এই জঙ্গলটাই তার অজানা রইলো। এই জঙ্গলের ওপারে কী আছে? এখনই নয়, পরে এক সময় তাকে জানতেই হবে।

নবলব্ধ লাঠিটা হাতে দোলাতে দোলাতে সে ফিরে এলো সেই মানুষের মতন বসে থাকা পাথরগুলির কাছে। একটি পাথরে হেলান দিয়ে বসলো। লাঠিটা রেখে দিল সামনে। প্রথম দিকের বিস্ময়কে এখন গ্রাস করেছে নৈরাশ্য। এতক্ষণ সে বুঝতে পেরেছে যে সে বন্দী। নির্জনতার কঠিন কারাগার তাকে ঘিরে আছে।

একটা প্রকাণ্ড বোঝার মতন তার মাথায় যেন চেপে বসল একাকীত্ব, সেই ভারে ঘাড় নুয়ে এলো, সেই যন্ত্রণায় তার চোখ দিয়ে জল এলো। কেন সে এখানে? কে তাকে এই নির্বাসনে পাঠালো? কোন অপরাধে?

বিশাল আকাশের নিচে একটি মানুষ হাঁটুতে মুখ গুঁজে কাঁদছে। কান্না তো কারুর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য। কিন্তু কেউ তাকে দেখছে না। কিংবা তাকে শুধু আকাশ দেখছে, বাতাস দেখছে, রোদ দেখছে। দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের মৃদু শব্দ।

মাঝে মাঝে মুখ তুলে শূন্য দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকছে সামনের দিকে। তার মুখমণ্ডলে অসম্ভব যন্ত্রণার চিহ্ন। কেন সে এই দ্বীপে এসেছে তা সে জানে না, এই না-থাকা ও না-জানাই তাকে অসম্ভব কষ্ট দিচ্ছে। এখন সে কী করবে? কিছু করার নেই বলেই সে কাঁদতে লাগলো, বুক একেবারে উজাড় করে।

সে রকম ভাবেই সে বসে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর একবার উঠে দাঁড়ালো। কয়েক পা হেঁটে গেল বিনা উদ্দেশ্যে। আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললো, কেন? কেন? কেন আমি এখানে? আবার তার মন-খারাপ হয়ে গেল। এবারে সে হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো বালির ওপরে। ক্রুদ্ধ শিশুর মতন সে দু'হাত মুঠো করে চাপড় মারতে লাগলো বালিতে আর কাঁদতে লাগলো বঞ্চিত, সর্বস্বান্ত পুরুষের মতন।

কিছুক্ষণ পর একটা সামান্য শব্দে সে চমকে মুখ তুলে তাকালো। একটা কাঠের গুঁড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছে একটা কাঁকড়া। হাতের তালুর মতন বড়, কালচে-খয়েরি রঙের, তার দিকেই চেয়ে আছে। কাঁকড়াটিকে দেখা মাত্র তার মধ্যে চড়াৎ করে জেগে উঠলো আদিমতম প্রবৃত্তি । তাকে বাঁচতে হবে। বাঁচতে হলে শরীরের আগুনকে নিয়মিত ইন্ধন দিতে হবে। এই তো তার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার খাদ্য।

সে আস্তে আস্তে লাঠিটা তোলার চেষ্টা করতেই পিঠটান দিল কাঁকড়াটি। সে তবু ছুটে গেল। কিন্তু মানুষের পক্ষে দৌড়োদৌড়ি করে কাঁকড়া ধরা সম্ভব নয়, তার আগেই

তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়।

মানুষটির এখনই যে খুব খিদে পেয়েছে তা নয়, কিন্তু খাদ্যচিন্তা মনে পড়ায় সে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। একমাত্র মানুষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো প্রাণীই একলা থাকতে পারে না। সুতরাং আরও কাঁকড়া এখানে আছে নিশ্চয়ই। সমুদ্রের ঢেউ-এ দুলছে কয়েকটি সিন্ধু-সারস, সেদিকেও মানুষটি কয়েক পলক তাকিয়ে রইলো। বড় সুন্দর, বড় পবিত্র চেহারার ঐ পাখিগুলি, কিন্তু ওরাও খাদ্য হতে পারে।

সমুদ্রের ধার দিয়ে কিছুটা হাঁটতে হাঁটতে তার চোখে পড়লো এক জায়গায় অসংখ্য লাল রঙের ফুল ছড়িয়ে আছে। সে একটু কাছে যেতেই ফুলগুলো জীবন্ত হয়ে এদিক ওদিক দৌড়োলো. তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল। আরও কাছে গিয়ে দেখতে পেল নরম বালিতে কাঁকড়াদের গর্তগুলো। হাতের লাঠি দিয়ে একটা দুটো গর্ত খুঁড়ে ফেলার চেষ্টাও করেও কোনো লাভ হলো না, কাঁকড়ারা হাজার-দুয়ারী বাড়িতে থাকে। সে একটু দূরে সরে যেতেই কাঁকড়ারা আবার সবাই উঠে আসে।

প্রয়োজনই উদ্ভাবনার জননী। সে অনেকগুলো নুড়ি সংগ্রহ করে এনে এক জায়গায় গাছের মতন অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। কাঁকড়াগুলো আবার নিশ্চিন্ত হতেই সে প্রবল দ্রুতভাবে ছুঁড়তে লাগল পাথর। একটাও লাগলো না। কাঁকড়াগুলো সব ঢুকে গেছে গর্তে।

নুড়িগুলো সে আবার কুড়িয়ে নিয়ে এলো। কিন্তু তখনকার মতন কাঁকড়া শিকার থামিয়ে সে চেয়ে রইলো সমুদ্রের দিকে। সূর্য এখনো বেশী উঁচুতে ওঠেনি, নীল জলের ওপর ছড়িয়ে আছে রক্তিম আভা। সেদিকে তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। এই অসীম জলরাশির মধ্যে এক জায়গায় শুধু একটা কালো বিন্দু। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখলে বোঝা যায়, তবু এক একবার মনে হয় নেই, কিছু নেই, চোখের ভুল। কালো বিন্দুটা সচল কিনা তা সে বোঝবার চেষ্টা করলো। যতদূর মনে হয় জিনিসটা স্থির। হয়তো আর একটা দ্বীপ।

কয়েকবার বৃষ্টিতে তার ট্রাউজার্স আগেই ভিজে গিয়েছিল, সেইজন্য সে নুড়িগুলো নামিয়ে রেখে, পোষাক পরেই নেমে পড়ল জলে। এখানে জল বেশ অগভীর, অনেকটা নেমে গিয়েও তার হাঁটু ডুবলো না। ছোট ছোট ঢেউ এসে তাকে ঝাপটা মারছে, তবুও এগিয়েই চললো সে। আরও খানিকটা যাবার পর আচমকা একটা বিশাল ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর, সে ডুবে গেল, জলের পরস্পর বিরোধী টানে ওলোট-পালট খেল তার শরীর। আবার সে ভেসে উঠলো ঢেউ-এর মাথায়, মসৃণভাবে তার হাত জল কাটতে লাগলো। সে আবিষ্কার করলো যে সে সাঁতার জানে।

ঢেউ ভেঙে সে আরও কিছুটা সাঁতরে গেল। কিন্তু সেই কালো বিন্দুটা আগেও যতখানি দূরে ছিল, এখনও ততখানি দূরে। অতদূর সে সাঁতরে যেতে পারবে না। তাছাড়া, সমুদ্র সম্পর্কে একটা অজ্ঞাত ভয়ও তার বুকে ছমছম করছে। এই সমুদ্রে হারিয়ে যাওয়ার চেয়ে অন্তত ঐ দ্বীপে বসে থাকা ভালো। সে আবার ফিরলো।

একটু গভীরে সমুদ্রের জল ঘন নীল, কিন্তু বেলাভূমির কাছাকাছি জল প্রায় স্বচ্ছ হাল্কা সবুজ রঙের। এত স্বচ্ছ যে ছোট ছোট মাছের ঝাঁক পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু এরকম নির্মল, সুদর্শন জলও সে খানিকটা আঁজলা করে তুলে জিভে ছুঁইয়েই আবার ফেলে দিল সঙ্গে সঙ্গে। অসম্ভব নোনতা, পানের একেবারে অযোগ্য, তার দারুণ তেষ্টা পেল। এই বিপুল জলরাশির মধ্যে দাঁড়িয়েও জলের জন্য আকুল হয়ে উঠলো সে।

সহজাত অনুভূতি দিয়েই সে বুঝলো যে পানীয় জলের সন্ধানে তাকে যেতে হবে সেই জঙ্গলের কাছেই। থাকলে ওখানেই থাকবে। সে একটা অভিমানের দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কার বিরুদ্ধে অভিমান তা সে জানে না।

এবারে আবার লাল ফুলের মতন কাঁকড়াগুলোকে ছড়িয়ে থাকতে দেখে প্রবল আক্রোশে যে নুড়িগুলো তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলো। এবারে সে সার্থক হয়েছে, দুটি কাঁকড়া আহত হয়ে উল্টে গেছে। সে ছুটে গিয়ে একটা বড় পাথর ঠুকে ঠুকে ওদের একেবারে নির্জীব করে দিল। একটি কাঁকড়ার পেট ফেটে ভেতরের মাংস বেরিয়ে পড়েছে। সেটাকে সে তুলে নিয়ে একটুখানি জিভ ঠেকালো। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ফিরিয়ে নিল অভক্তিতে। সে কাঁচা খেতে পারবে না, তার আঁশটে গন্ধ লাগছে।

কাঁকড়া দুটি হাতে ঝুলিয়ে সে ফিরে এলো সেই মানুষ-প্রমাণ পাথরের জায়গাটায়। যেন এই জায়গাটিকে সে নিজের অজ্ঞাতসারেই নিজের বিশ্রামস্থান হিসেবে ঠিক করে ফেলেছে। সেখানে বসে সে হাতের মুঠোমাপের-দুটি পাথরের টুকরো জোগাড় করে ঠুকতে লাগলো। যথারীতি আগুনের ফুলকি ঝলসে উঠলো মাঝে মাঝে। একটা বড় পাথরের দিকে ফিরে, নিজের পিঠ দিয়ে সূর্য আড়াল করে সে ফুলকিগুলো দেখতে পেল আরও স্পষ্ট ভাবে। কিন্তু সে জানে, এভাবে আগুনকে ধরে রাখা যাবে না। শুকনো ডালপালা ও পাতা জোগাড় করতে হবে।

ক্রমশ তার তেষ্টাও বাড়ছে। শরীরের মধ্যে জ্বলছে চিতা। তার নিশ্বাসও গরম। তাকে জলের সন্ধানে যেতেই হবে। কিন্তু এই সময় আবার বৃষ্টি নামতেই সে দারুণ চঞ্চল হয়ে উঠলো। এই তো পানীয় জল! সে মুখটা উঁচু করে হাঁ করে রইলো আকাশের দিকে। এক পশলা বেশ জোরে বৃষ্টি হলো অল্প সময়ের জন্য।

বৃষ্টির সময় সিন্ধু সারসেরা জল ছেড়ে আকাশে ওড়াউড়ি করে। আকাশের দিকে মুখ তুলে থাকা একজন মানুষকে শুধু তারাই দেখে গেল। পাখিদের চোখের ভুরু নেই বলে তাদের বিস্ময় আলাদাভাবে বোঝা যায় না।

বৃষ্টি শেষ হবার পর লোকটি নিজের ওপর খানিকটা বিরক্ত হয়ে বসে রইলো। এভাবে তৃষ্ণা খানিকটা মিটলেও তৃপ্তি হয় না। বৃষ্টির জল ধরে রাখতে হবে।

লাঠিটা দিয়ে সে বালি খুঁড়তে শুরু করলো তখন। লাঠি দিয়ে খানিকটা খুঁচিয়ে তারপর হাত দিয়ে বালি তুলে সরিয়ে রাখতে লাগলো অন্যদিকে। এক মনে এই কাজ করে যাওয়ার পর এক সময় বেশ একটা চৌকো পুকুরের মতন হলো, এক হাত চওড়া। তারপর সে বসে রইলো পরবর্তী বৃষ্টির প্রতীক্ষায়।

এবারে বৃষ্টি এলো একটু দেরি করে। এবারেও বেশ জোর বৃষ্টি হলো বটে, কিন্তু নতুন পুকুরে এক বিন্দু জলও জমলো না। এখানে মাটির তৃষ্ণা এমন সাঙ্ঘাতিক যে বৃষ্টি পড়া মাত্র তা শুষে নেয়।

মানুষটি কিন্তু এতে নিরুদ্যম হলো না। সঙ্গে সঙ্গে তার দ্বিতীয় উপায় মনে এসে গেছে। সে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো দূরের টিলার দিকে। জঙ্গলে যেতেই হবে। এই পুকুরের গর্তটা আরও বড় করে তারপর সব জায়গায় গাছের পাতা ভালো করে বিছিয়ে দিলেই জল ধরে রাখা যায়। বৃষ্টি এখানে এত ঘন ঘন হয় যে জলের জন্য চিন্তা নেই।

তা ছাড়া সারা দিন ধরে বার বার সে এরকম বৃষ্টিতে ভিজলে বাঁচতে পারবে না। তার মাথার ওপর আচ্ছাদন চাই।

লাঠিটা নিয়ে সে উঠে দাঁড়াতেই দুটো কাঁকড়ার মধ্যে একটা একটু নড়াচড়া করে উঠলো।

সে বললো, কী রে, পালাতে চাস নাকি?

বলেই দারুণ চমকে গেল সে। এতক্ষণ সে একটাও কথা বলেনি। এই নির্জনতার মধ্যে তার নিজের কণ্ঠস্বরটাই কেমন অদ্ভুত শোনাল। তবু নিজের গলার আওয়াজ শুনে একটু খুশীও হলো সে। যেন একজন সঙ্গী।

এবারে সে আকাশের উদ্দেশে খুব জোরে বলে উঠল, আমায় এখানে কে পাঠিয়েছে? কেন? আমি কি দোষ করেছি?

আকাশ থেকে উত্তর আসবে না, সে জানে। তবু কিছু একটা শব্দ শোনবার জন্য সে চিৎকার করতে লাগলো, আ-আ-আ-আ...।

খানিকবাদে সে লাঠিটা হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলো জঙ্গলটার দিকে। বিরক্তিতে কুঁচকে আছে তার ভুরু, তার ঠোঁটে অভিমান-লেখা। সে তার পরিচয় মনে করতে পারছে না বলেই এই নির্জন দ্বীপে তার ভূমিকাটা বুঝতে পারছে না।

জঙ্গলটার সামনে গিয়ে সে আবার থেমে রইলো একটুক্ষণ। সতর্কভাবে তাকালো চারদিকে। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে সাবধান করে দিচ্ছে। আবার তার মনের আর একটা কোনো অংশ তাকে প্রেরণা দিচ্ছে অজানাকে জানবার জন্য।

এবার সে একটুখানি এগিয়ে একটি গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলো। উৎকর্ণ হয়ে শোনবার চেষ্টা করলো ক্ষীণতম কোনো শব্দ। কিন্তু হাওয়ায় শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া আর কোনো জৈব শব্দ নেই।

আর একটুখানি গিয়ে সে আবার একটা মোটা গাছের পেছনে দাঁড়ালো। তার মনের সবখানি জোর সে তার দু চোখে এনেছে। হাতের লাঠিটা ধরে আছে শক্ত করে। বারবার দেখে রাখছে পেছন দিকটা, যদি হঠাৎ পালাতে হয়, তাহলে সে কোন্ দিকে পালাবে।

যে-হেতু তার সমস্ত শরীরে উত্তেজনা, সেইজন্য তার পুরুষাঙ্গও কঠিন হয়ে উঠেছে।

গাছের আড়ালে আড়ালে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর সে একটা ভালো জিনিস

আবিষ্কার করলো। একটা ছোট জলাশয়। দেখলেই বোঝা যায়, সেই জলাশয় কেউ তৈরি করেনি, অসমান একটা খাদ, সেখানে নিশ্চয়ই বৃষ্টির জল জমে জমে এমন হয়েছে। গাছের পাতা পড়ে পচে সেই জলের রং কালচে।

হাত দিয়ে খানিকটা জল তুলে সে জিভে ছোঁয়ালো। না, নুন নেই।

ঠিক এই সময় সে শুনতে পেল গর্জন। চমকে উঠে সে একটা গাছ সেঁটে দাঁড়ালো। প্রথমে মনে হয়েছিল মেঘের গর্জন। কিন্তু ভালো করে শুনে আবার বুঝতে পারলো, কতকগুলো পশু একসঙ্গে রাগী চিৎকার শুরু করেছে। এই আওয়াজ এগিয়ে আসছে তার দিকেই।

তক্ষুনি সে জঙ্গলের বাইরের দিকে ছুটতে শুরু করলেও সেই অবস্থায় অনেক কিছু চিন্তা করে নিল। যে জানোয়ারগুলোর ডাক সে শুনেছে, তা অনেকটা কুকুরের ডাকের মতন। কুকুর থাকলেই সঙ্গে মানুষও আছে মনে হয়। সেই মানুষেরা কেমন? এই নির্জন দ্বীপের মানুষ হিংস্র হওয়াই সম্ভব। কিন্তু এইভাবে কি সে বাঁচতে পারবে? খোলা মাঠে একদল কুকুর তাড়া করলে সে দৌড়ে তাদের হারাতে পারবে?

তক্ষুনি থেমে গিয়ে সে একটা মাঝারি গাছের গুড়ি ধরে পড়ি-মরি অবস্থায় উঠে গেল। লুকিয়ে রইলো ঘন পাতার আড়ালে। অসম্ভব জোরে তার নিশ্বাস পড়ছে। নাক দিয়ে যেন বেরুচ্ছে আগুনের হল্কা।

জঙ্গলের মধ্যে তোলপাড় জাগিয়ে প্রায় দশ বারোটি কুকুর এগিয়ে এলো এদিকে। ওদের পেছনে কোনো মানুষ নেই। কুকুরগুলির গায়ের রং ধূসর ও পাটকিলে মেশানো, নেকড়ের মতন ছুঁচোলো মুখ, কিন্তু আকারে খুব বড় নয়, বরং মাঝারি ধরনের। কিন্তু তাদের ডাক যেমন জোরালো তেমনই নিষ্ঠুর ধরনের।

গাছের ওপরে লুকিয়ে থেকে সে দেখলো, কুকুরগুলো আসলে তাড়া করে আসছে একটা দাঁতালো বুনো শুয়োরকে। এক একবার কয়েকটি কুকুর সেই শুয়োরটাকে ধরে ফেলে তার গা থেকে মাংস খুবলে নিচ্ছে, শুয়োরটি পড়ে যাচ্ছে মাটিতে। আবার সে কোনোক্রমে উঠে দৌড়োচ্ছে।

একটুক্ষণের মধ্যেই জঙ্গল ছাড়িয়ে শুয়োরটি গিয়ে পড়লো খোলা জায়গায়। দাঁতালো শুয়োরটি একেবারেই লড়তে পারছে না, আগেই সে সাঙ্ঘাতিক আহত। বোঝাই গেল, আর তার বাঁচার আশা নেই। শুয়োর দৌড়োয় নাক বরাবর সোজা, সেই তুলনায় কুকুরগুলো বিদ্যুতের মতন এদিকে ওদিকে ঘুরে যায়। ক্রমে তারা শুয়োরটিকে গোল করে ঘিরে ধরলো, শুয়োরটি চিৎ হয়ে পড়ে ছটফট করলো মাত্র কয়েকবার, তারপর আর তাকে দেখা গেল না।

খানিকবাদে কুকুরগুলো যখন ছত্রখান হয়ে গেল, তখন দেখা গেল সেখানে কোনো শুয়োর নেই। কিছু রক্ত আর দুটো দাঁত পড়ে আছে।

গাছের ওপরের মানুষটির শরীর ঘামে ভিজে গেছে।

॥ ২ ॥

এর মধ্যে দু'বার সূর্য অস্ত গেছে।

সমুদ্রের কাছে সেই পাথুরে জায়গাটিকে সেই নিঃসঙ্গ মানুষটি এর মধ্যে একটা ঘর বানিয়ে ফেলেছে। এখানে আগে থেকেই কয়েকটা গাছের গুঁড়ি কেন পড়েছিল সে জানে না। জঙ্গল থেকে আরও ডালপালা ও লতাপাতা এনে সে কোনো ক্রমে গড়ে তুলেছে নিজের আস্তানা। এখানে ঘন ঘন বৃষ্টি হয়, এখন সে মাথার ওপর ছাউনি পেয়েছে।

এই তিনটি দিনের বেলা সে বন্য কুকুরের আক্রমণে সব সময় সন্ত্রস্ত হয়েছিল, কিন্তু কুকুরের ঝাঁক এর মধ্যে আর জঙ্গলের বাইরে আসেনি।

এই দুটি দিনের মধ্যেই মানুষটির কিছু কিছু সঞ্চয় হয়েছে। পাথর ঠুকে আগুন জ্বালতে সক্ষম হয়েছে, সেই আগুন আর নিভতে দেয়নি, একটা বড় গাছের গুঁড়ি ধিকি ধিকি জ্বলছে তার ঘরের মধ্যে। মৃত শুয়োরটির দাঁত দুটি সে কুড়িয়ে এনে অস্ত্র হিসেবে রেখেছে, একটা লাঠির ডগায় একটা ধারালো পাথর বেঁধে সে কুড়ুল বানিয়েছে। গোটা দশেক কাঁকড়াকে আধ মড়া অবস্থায় ধরে এনে লতা দিয়ে তাদের বেঁধে ফেলে রেখেছে ঘরের সামনে। তার এক বর্গহাত পুকুরটিতে এখন বৃষ্টির জলও জমেছে।

মনে হয় যেন সে কতদিন ধরে এখানে আছে।

তৃতীয় ঊষায় তার জীবনে নতুন চমক এলো।

দ্বীপের মানুষ সূর্য ওঠার ঠিক সঙ্গে সঙ্গে জাগে। তরুণ মানুষটিও চোখ মেলার পরই উঠে পড়ে ঘরের বাইরে এসে দেখে নিল তার সব সম্পত্তি ঠিকঠাক আছে কিনা। তারপর দেখলো আকাশ। আজকের আকাশ মেঘলা মেঘলা। একদিকে নতুন সূর্যের চাপা দীপ্তি, অন্যদিকে বিদ্যুৎ-চমক। বাতাস খুব প্রবল। আজ বেশ বড় রকমের ঝড় বৃষ্টি আসবে।

জমানো জলে চোখ-মুখ ধুয়ে নিল তরুণ মানুষটি। শুধুমাত্র বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই, সেইজন্য কোনো ব্যস্ততাও নেই। রাত্রে শুয়ে শুয়েই সে চিন্তা করেছে, আজ সে একটা হাঁস ধরবার চেষ্টা করবে। কোনো লোভের কারণে নয়, এমনিই সময় কাটাবার জন্য।

এই দ্বীপে গরম বেশী নয়, আবার রাতের ঠাণ্ডাও তেমন পড়ে না। কিন্তু সারারাত সামুদ্রিক বাতাস লেগে শরীর চটচটে হয়ে থাকে। সেই জন্য সকালে উঠেই স্নান করতে ইচ্ছে করে। সমুদ্রের নোনা জলে স্নান করলেও আরও চটচটে হয় শরীর, তবু উপায় তো নেই। এখন স্নানও হবে, হাঁস ধরার চেষ্টাও চলবে।

শুধু শুধু ট্রাউজার্স ভিজিয়ে লাভ নেই বলে গতকাল সে নগ্ন হয়েই জলে নেমেছে। আজও ট্রাউজার্সের জিপারে হাত দিতেই সে একটা কান্নার আওয়াজ শুনতে পেল।

প্রথমে মনে হলো মনের ভুল। তবু আরও কয়েকবার শুনতে পেল সে। খুবই ক্ষীণ

শব্দ। বাতাসের উচ্ছ্বাসে এক একবার ভেসে আসছে, আবার থেমে যাচ্ছে। আওয়াজটা আসছে যেন সমুদ্রের ভেতর থেকে।

তার বাড়ির সংলগ্ন গোল-পাতা গাছটিতে উঠে গেল তরুণ মানুষটি। তিন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রথমে কিছু দেখতে পেল না। তারপর চোখে পড়লো, কিছু দূরে সমুদ্রের ধার ঘেঁষে একটি ছোট চেহারার মানুষ হাঁটু গেড়ে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।

তখুনি গাছ থেকে না নেমে সে ছোট মানুষটিকে লক্ষ করলো আরও কিছুক্ষণ। সেই মানুষটি নড়ছে না একটুও। তবে কান্নার শব্দটা ঐদিক থেকেই আসছে।

এবার কৌতূহল তাকে ঠেলে নিয়ে চললো ছোট মানুষটির দিকে। যতদূর সম্ভব আন্দাজে সে বুঝেছে যে ছোট মানুষটির উচ্চতা বড় জোর তার বুকের সমান, চেহারাও এমন কিছু শক্তিশালী নয়। ঐ রকম একলা মানুষের কাছ থেকে তার বিশেষ কোনো ভয় নেই বটে, তাহলেও সে কুড়ুলটি সঙ্গে নিল।

কাছাকাছি গিয়ে সে বুঝতে পারলো, ছোট মানুষটি প্রায় সুর করে কেঁদে চলেছে, যেন সমুদ্রকে সে একটা গান শোনাচ্ছে।

ছোট মানুষটি একবার মুখ ফেরাতেই বোঝা গেল, সে আসলে একটি বালক। দশ-এগারো বছর হবে। সুন্দর, মসৃণ, নিষ্পাপ মুখ।

তরুণ মানুষটিকে দেখতে পেয়ে ছেলেটি কান্না থামিয়ে দিলেও তার মুখে ফুটে উঠলো সাঙ্ঘাতিক আতঙ্কের চিহ্ন। মানুষের স্বভাবই এই, অচেনা মানুষ দেখলেই শত্রু বলে মনে হয়। বিশেষত তরুণ মানুষটির কাঁধের ওপর রাখা কুঠার। ছেলেটি তার কোমল দুটি হাত তুলে ফেললো আত্মরক্ষায় ভঙ্গিতে।

তরুণটি প্রথমেই দুটি জিনিস লক্ষ করলো। ছেলেটি পরে আছে একটি বোতল-সবুজ রঙের হাফ প্যান্ট, আর তার গাটা খালি হলেও গলায় সুতো বাঁধা একটা এক বিঘৎ লম্বা মতন জিনিস ঝুলছে। সেই জিনিসটা যে কী তা সে কিছুতেই মনে করতে পারলো না। কিন্তু তার অবচেতন মনে বুঝতে পারলো, ঐ জিনিসটা সে এক সময় চিনতো।

তরুণটি প্রশ্ন করলো, তুমি কে? এখানে কোথা থেকে এসেছো?

ছেলেটি কোনো উত্তর দিল না, এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তার মুখের দিকে।

তরুণটি বালকের মুখের ভয়ের চিহ্ন পড়তে পারলো। তার মায়া হলো। সে কুড়ুলটি নামিয়ে রেখে ছেলেটির পাশে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলো। তারপর নরম গলায় বললো, আমায় ভয় পাচ্ছো কেন? ভয় নেই। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো?

ছেলেটির গালে চোখের জলের রেখা। মাথার চুল এলোমেলো। সরল চোখ দুটি বিস্ফারিত। সে আস্তে আস্তে ঘাড় নেড়ে তরুণটির প্রশ্নের ভাষাতেই উত্তর দিল, হ্যাঁ।

তরুণটি জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি ওদিকের জঙ্গল থেকে এসেছো?

ছেলেটির কণ্ঠস্বর থেকে এখনো কান্না মিলিয়ে যায়নি। সে আনুনাসিক সুরে বললো, জানি না।

—তুমি কি সমুদ্রের দিক থেকে এসেছো ?

—জানি না।

—কে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে, তাও মনে নেই নিশ্চয়ই ? তোমার নাম মনে আছে ?

ছেলেটি দু'দিকে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বললো, না ! আবার দু' চোখ জলে ভরে এলো তার।

তরুণটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এই ছেলেটিরও স্মৃতি নেই। তার মনে পড়লো, তারও তো চোখ দিয়ে জল এসেছিল। এইটুকু ছেলে তো আরও অনেক বেশী কষ্ট পাবেই।

সে ছেলেটির পিঠে সস্নেহে হাত রেখে বললো, খোকা, আমার অবস্থা তোমারই মতন। আমারও কিছু মনে নেই। কে আমাকে এখানে ফেলে রেখে গেছে জানি না। তোমাকেও তারাই ফেলে গেছে। শয়তান, শয়তানের দল। তোমার মতন একটা ছোট ছেলেকেও...

ছেলেটি তরুণের কাঁধে মুখ চেপে হু-হু করে কেঁদে উঠলো।

আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে তরুণ ভাবলো, সে হয়তো আগের জীবনে গুরুতর কোনো অপরাধ করেছে, তাই তাকে শাস্তি দিয়ে এই নির্বাসনে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এইটুকু একটা ছেলে কী এমন অপরাধ করতে পারে, যার জন্য এমন কঠিন শাস্তি।

ঝোড়ো হাওয়া ক্রমশ উত্তাল হয়ে আসছে, লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে সমুদ্রের ঢেউ, হঠাৎ হঠাৎ শোনা যাচ্ছে আকাশের কামান গর্জন। ছেলেটি আরও ভয় পেয়ে জোরে আঁকড়ে ধরছে, তরুণকে।

তরুণ বললো, খোকা, ওঠো। আমার বাড়িতে চলো।

বলতে বলতেই বৃষ্টি এলো দারুণ জোরে। ছেলেটির হাত ধরে ছুটলো তরুণ। বাচ্চা ছেলেটি এখনো যেন খানিকটা ঘোরের মধ্যে আছে, সে ঠিক মতন দৌড়োতে পারছে না, হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে বারবার। তরুণ তাকে কাঁধে তুলে নিল।

নিজের জায়গায় পৌঁছে দেখলো, তার সদ্য-গড়া বাড়িটি এর মধ্যেই এক দিকে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। এই প্রবল ঝড়ের উপদ্রব সইতে পারেনি। এর আগের দু'দিন এত তেজী ঝড়ও হয়নি।

ছেলেটিকে নামিয়ে দিয়ে সে তক্ষুনি ঘর মেরামত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তার মুখে ফুটে উঠলো কয়েকটি রেখা, নিজের সৃষ্টি নষ্ট হতে দেখলে সব মানুষের মুখেই এরকম রেখা ফুটে ওঠে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। তার ঠুনকো বাড়ির চালটা ঝড়ের এক ধাক্কায় উড়ে গিয়ে পড়লো খানিকটা দূরে। ঝড় না থামলে কিছুই করা যাবে না বুঝে সে চালটি টেনে আনলো একটা পাথরের পাশে, তারপর সেটার ওপরেই বসে পড়লো। ছেলেটিও

বসলো তার গা ঘেঁষে।

দু'জনে কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগলো সমুদ্র ও ঝড়ের যুদ্ধ। আকাশ এখন দেখা যায় না। সমুদ্র ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মতন বারবার লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে ঝড়ের টুঁটি চেপে ধরতে চাইছে। ঝড়ও যেন ঢুকে যেতে চাইছে সমুদ্রের হৃৎপিণ্ডের দিকে। এই সব মিলিয়ে যে শব্দ, সেটাও যেন জীবন্ত কোনো প্রাণীর !

সমুদ্রের এক একটা ঢেউ পাড়ের ওপর উঠে আসছে অনেকখানি প্রায়। ওদের পায়ের কাছে। ঢেউয়ের সঙ্গে উঠে আসছে অনেক কিছু, আবার ফিরেও যাচ্ছে, পড়ে থাকছে শুধু কিছু ঝিনুক, আর অদ্ভুত চেহারার কিছু জলজ পোকা। একবার একটা মাঝারি আকারের চাঁদা মাছ ঢেউ-এর সঙ্গে এসে আর ফিরে যেতে পারলো না। অসহায় ভাবে লাফাতে লাগলো।

ছেলেটি সবিস্ময়ে বললো, একটা মাছ !

বালকের কৌতূহল তার শোককে চাপা দেয়। তরুণটি কিছু বলবার আগেই সে দৌড়ে গিয়ে মাছটিকে দু হাতে ধরে তুলে নিয়ে ফিরে এলো।

রুপো রঙের চকচকে মাছটি তখনও ছেলেটির হাতে ছটফট করছে। তরুণ বললো, দাও, ওকে আমাদের পুকুরে ছেড়ে দিই।

মেয়েলি ব্রতের পুকুরের মতন ছোট পুকুরটিতে মাছটিকে ছেড়ে দেওয়া মাত্র সে জল কেটে বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগলো পুকুরের চারদিকে। মাছটিও খুবই বিস্মিত নিশ্চয়ই। সমুদ্রের মাছ আগে তো এত সীমারেখা দেখেনি।

বৃষ্টি আগেই উড়ে গিয়েছিল, এবার ঝড় খানিকটা নিস্তেজ হতেই আবার ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হলো। তরুণ জানে, এই বৃষ্টি বেশীক্ষণ থাকবে না।

সে জিজ্ঞেস করলো, খোকা, তোমার বাবা-মায়ের কথাও মনে নেই ?

সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝতে পারলো, এখনই এই প্রশ্ন তার না তোলাই উচিত ছিল। ছেলেটি মনোযোগ দিয়ে দেখছিল মাছটির গতিবিধি। এবার সে মুখ তুলতেই আবার তার চোখ সজল হয়ে গেল, ফাঁকা গলায় বললো, না !

অর্থাৎ বাবা-মায়ের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে গেলেও স্নেহের জন্য আকুলতা তার মধ্যে রয়ে গেছে।

তরুণ ভুরু কুঁচকে একটা কথা ভাবলো ! ছেলেটিকে কে বা কারা রেখে গেল এখানে ? ঐটুকু ছেলে নিশ্চয়ই জলে ভাসতে ভাসতে আসেনি। রাত্তিরে কোনো শব্দ তো সে শুনতে পায়নি। বাচ্চা ছেলেটি ও তার প্যান্টের রং এক ! তবে কি আগে ওরা একই জায়গায় ছিল ?

—খোকা, তোমার খিদে পেয়েছে ?

—না।

—এখন পায়নি। কিন্তু পরে তো পাবে। দেখি কি খাবারের ব্যবস্থা করা যায়। দাঁড়াও। আগে দেখি আগুনটা জ্বলছে কিনা।

যে-বড় কাঠের গুঁড়িটা সে ধরিয়ে রেখেছিল, তার ওপরে এখন সাদা রঙের ছাই। কিন্তু ঘরের ছাদ উড়ে গেলেও সেই গুড়িটা ছিল একটা বড় পাথরের খাঁজে, তাই সোজাসুজি বৃষ্টির ছাঁট পড়ে নি গুঁড়িটার ওপরে। সেই সাদা রঙের ছাই ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিতেই তলায় ধিকিধিকি আগুনের সন্ধান পাওয়া গেল।

তরুণ জোরে জোরে ফুঁ দিয়ে চাঙ্গা করবার চেষ্টা করলো আগুনটাকে। সে বেশ দমে গিয়েছিল। আবার আগুন জ্বালাতে গেলে অনেক উদ্যম খরচ করতে হতো।

আগে ঘরটা সারিয়ে ফেলাই বেশী দরকার, তাই তরুণ লেগে পড়লো সেই কাজে। খোকা তাকে সাহায্য করলো নিজে থেকেই। বিপদের মধ্যে আত্মীয়তা খুব দ্রুত হয়। খোকার আড়ষ্টতা অনেক কেটে গেছে।

ঘরটাকে আবার খাড়া করবার পর তরুণ সেটিকে যথা সম্ভব মজবুত করলো। তারপর ঘরের ভেতরের আয়তনটা পরীক্ষা করে সে বললো, এখানে আমরা দু'জনে বেশ ভালো ভাবেই শুয়ে থাকতে পারবো, তাই না খোকা?

খোকা বললো, হ্যাঁ। কিন্তু আমরা এখানে ক'দিন থাকবো?

তরুণের ঠোঁটে হাসি দেখা গেল। কোথা থেকে এসেছে, কে পাঠিয়েছে সে জানে না। ফেরার কথা সে কী করে জানবে! আর কি কখনো এখান থেকে ফেরা যাবে? কিন্তু এই বালককে সেই কথা বলে কোনো লাভ নেই।

সে বললো, হ্যাঁ, ফিরে যাবো তো একদিন বটেই। কিন্তু দেখো, এখানে থাকতে তোমার খারাপ লাগবে না। অনেক মজা হবে। তুমি কাঁকড়া ধরতে পারো? তোমায় আমি শিখিয়ে দেবো।

—কাঁকড়া?

—তুমি কাঁকড়া কাকে বলে জানো না?

—কী জানি, মনে নেই! তুমি এখানে কবে এসেছো?

—তিন দিন আগে।

—এখানে আর কেউ নেই?

—আমি তো দেখিনি। এই ক'দিন আমি একাই ছিলুম, আজ তুমি এলে, আমরা দু'জন হলুম।

মেঝেতে বসে পড়ে তরুণ বললো, একটু বাদে আমি তোমাকে এই দ্বীপের অনেকগুলো জায়গা ঘুরে দেখিয়ে দেবো। এক দিকে একটা ঘন জঙ্গল আছে, সেখানে কিন্তু কক্ষনো একা একা যেও না। সেখানে বিপদ আছে।

—বিপদ মানে কী? সেই জঙ্গলে কী আছে?

—হিংস্র জন্তু আছে! তোমার গলায় এটা কী, দেখি! হাত বাড়িয়ে সে খোকার গলায় সুতো দিয়ে ঝোলানো লম্বা, কালো জিনিসটি খুলে নিল। উল্টে পাল্টে দেখলো।

—এটা কী জানো, খোকা?

—না।

জিনিসটির একদিকে দু'সারি চৌকো চৌকো ফটো। কিছু না ভেবেই তরুণ সেটাকে মুখের কাছে আনলো। তারপর ফুঁ দিল। সঙ্গে সঙ্গে সেটা থেকে বেরিয়ে এলো চমৎকার সুরের ঝংকার।

দু'জনে চমকে দু'জনের মুখের দিকে তাকালো।

জিনিসটা একটা মাউথ অর্গান।

তরুণ জানে না সে কি বাজাচ্ছে, তবু আপনা আপনি সে একটা নিখুঁত সুর বাজিয়ে চললো। হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে গেল তার নির্বাসনের যাতনা। সে যেন তার খুব প্রিয় কোনো জায়গায় বসে আছে।

একটু বাদে খোকা বললো, আমাকে একটু দাও!

খোকা মাউথ অর্গানটি বাজাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার দক্ষতা নেই। ছোট ছেলেরা যেমন এলোমেলো বাজায়, সেই রকম সে বাজালো খানিকটা।

তার কাছে থেকে আবার নিয়ে তরুণ আর একটা সুর ধরলো। দীর্ঘ, প্রলম্বিত, করুণ সুর। যত বাজাচ্ছে ততই সে অবাক হচ্ছে। এই জিনিসটা কী তাই সে জানে না, বাজনা কাকে বলে তাও সে জানে না। তবু নিখুঁত সুরের মূর্ছনা তার শ্রবণে একটা আনন্দের তরঙ্গ হয়ে উঠছে। সে কিছুক্ষণের জন্য এই দ্বীপটির কথা ভুলে গেল, অন্য কোনো জায়গার কথাও মনে পড়লো না, তার মন ভেসে রইলো সম্পূর্ণ শূন্যতার মধ্যে।

॥ ৩ ॥

তরুণ ও বালকটিও কাটিয়ে দিল দু'দিন।

তরুণ এখনো হঠাৎ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, তার ভুরু কুঁচকে যায়, যা তার স্মৃতিতে নেই, তাও সে মনে করবার চেষ্টা করে। কিন্তু খোকার আর অস্থিরতা নেই, এই আকাশ ও সমুদ্র এবং ছোট ঘরটিতে সে অনেক আনন্দের উপকরণ পেয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই খলখল হাসির শব্দ সমুদ্রের দিকে উড়ে যায়।

খোকার সংগ্রহ প্রবণতা অনেক বেশী। এর মধ্যেই সে অনেক কিছু জমিয়ে ফেলেছে। বেলাভূমি থেকে সে কুড়িয়ে এনেছে এক গাদা নানা রং ও আকারের ঝিনুক। একটা মাঝারি আকারের শাঁখও পেয়েছে। শাঁখটিকে সে যখন দেখে, তখন সেটি চলন্ত ছিল। খোকা দৌড়ে গিয়ে শাঁখটিকে ধরতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে ভয় পেয়েছিল। সে ভেবেছিল, ঐ জন্তুটা তাকে কামড়ে দেবে। তরুণ সেই সময়টায় সমুদ্রে নেয়ে হাঁস ধরার ব্যর্থ চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল, খোকার ডাক শুনে ওপরে উঠে এসে পলায়মান শাঁখটিকে দেখে সে পা দিয়ে উল্টে দিল। তারপর বললো, বাঃ, চমৎকার জিনিস পেয়েছিস তো!

এছাড়া খোকা বহু রকমের পাথরের টুকরোও জমিয়ে চলেছে। গাছের ডাল দিয়ে একটা ধনুক ও কয়েকটা তীর বানিয়েছে। কয়েকটা বড় বড় হাঁসের পালক তার খুব প্রিয় সম্পদ।

মাঝে মাঝেই খোকা নিজের মনে কথা বলে। ঐ পালক, শাঁখ, পাথরের টুকরোগুলো যেন তার এক একটা মন-গড়া চরিত্র, ওদের সঙ্গে তার খুব ভাব।

ওদের খাদ্য সমস্যারও অনেকটা সুরাহা হয়েছে। তরুণ এখন পর্যন্ত একটাও হাঁস ধরতে পারেনি বটে, কিন্তু তার বদলে অন্য একটি উপাদেয় জিনিস পেয়ে গেছে।

যেখানে সমুদ্রের গা দিয়ে প্রথম টিলাটি উঠেছে, সেখানে ওরা এক বিকেলে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে ওরা এক সঙ্গে দু'রকম জিনিস পেয়ে গেল।

খোকাই প্রথম চেঁচিয়ে বলেছিল, ঐ দ্যাখো, ঐ দ্যাখো! ওগুলো কী? পাথর দৌড়োচ্ছে নাকি?

তরুণ কিন্তু দেখেই চিনতে পারলো। তিনটি বেশ বড় কচ্ছপ। সে দৌড়ে তাড়া করে যেতে যেতেই একটি নেমে গেল জলে, অন্য দুটিকে সে উল্টে দিল। খুশীতে চকচক করে উঠলো তার চোখ। সমুদ্র যেন তাদের জন্য এই উপকারী উপহার পাঠিয়ে দিয়েছে। এত বড় দুটো কচ্ছপে তাদের অনেক দিনের খাবার চলে যাবে।

তরুণ যেন কী ভাবে জানে যে একবার উল্টে দিলে কচ্ছপেরা কিছুতেই আর নিজে থেকে সোজা হতে পারে না।

কচ্ছপ দুটি চিৎ হয়ে অসহায় ভাবে ড্যাবডেবে চোখ মেলে দেখতে লাগলো ওদের। খুব সম্ভবত তারা আগে এরকম বিশ্রী ধরনের লম্বা দ্বিপদ বিপদ আগে দেখেনি।

খোকা জিজ্ঞেস করলো, ওরা কামড়ায়?

তরুণ বললো, আমরা ওদের মারবার চেষ্টা করলে ওরাও বাঁচবার চেষ্টা করবে নিশ্চয়ই।

খোকা ঠিক যেন বুঝতে পারলো না কথাটা। তরুণের মুখের দিকে একটুক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে থেকে বললো, ওরা জলের মধ্যে থাকে কেন? সেখানে কী করে?

তরুণ বললো, আর কিছুই করে না। শুধু যতদিন সম্ভব বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। আমরাও তো তা-ই করি।

—আমরা ওদের মারবো কেন?

—ওদের মাংস খেয়ে বেঁচে থাকবো। যেমন ওরাও ছোট ছোট পোকা-মাকড় কিংবা মাছ-টাছ খায়।

—ওরা আর সোজা হতে পারছে না কেন?

—ওদের যে হাত আর পা খুব ছোট ছোট। আমরা চিৎ হয়ে শুলে হাতের ভর দিয়ে আবার উঠে বসি। ওদের যে হাত মাটি পর্যন্ত পৌঁছোয় না।

—কেন ওদের হাত-পা অত ছোট ছোট?

—তা তো জানি না! তুই দাঁড়া, আমি ওদের আগে বেঁধে ফেলি।

টিলার পাশে যে ছোট ছোট ঝোপ, সেখানে অনেক লতা আছে। এক সঙ্গে অনেক লতা ছিঁড়ে, সেগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ি পাকালো তরুণ। তখনই সে দেখতে পেল, ঐ ঝোপে একরকম ফল ফলে আছে। একটা ফল ছিঁড়ে সে কামড় দিল। খুব একটা বিস্বাদ নয়, খাওয়া যায়। ফলগুলো দেশি আমড়ার মতন লম্বাটে কিন্তু ভেতরে পেয়ারার মতন ছোট ছোট বিচি। একেবারে ভেতরের অংশটায় মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ।

খোকা তখন নিবিড় মনোযোগ দিয়ে কচ্ছপ দুটিকে দেখছিল, তরুণ ডাকলো, খোকা, এদিকে শুনে যা!

খোকা সেখানে গেলে তরুণ তার হাতে একটা ফল তুলে দিয়ে বললো, খেয়ে দ্যাখ তো, কেমন?

খোকা কচর মচর করে পুরো ফলটা খেয়ে নিয়ে বললো, ভালো!

—কয়েকটা ফল ছিঁড়ে তোর প্যান্টের পকেটে নিয়ে নে। যখন খিদে পাবে তখন খাবো।

খোকা কয়েকটা ফল ছিঁড়তে ছিঁড়তে হঠাৎ থেমে গেল। সাদা রঙের কৌতূহল মাখানো মুখটা ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই যে আমি ফলটা খেলুম, তার মানে কি ফলটা মরে গেল?

তরুণ সংক্ষেপে বললো, হ্যাঁ।

পাকানো লতাগুলো নিয়ে সে চলে এলো কচ্ছপ দুটোর কাছে। খুব সহজেই সে হাত-পাগুলো বেঁধে ফেললো, তারপর টানতে টানতে নিয়ে চললো তার ঘরের দিকে। এই ক'দিন অনবরত কাঁকড়া খেয়ে একঘেয়েমি এসে গিয়েছিল, আজ অন্যরকম কিছু একটা খাওয়া হবে, এই চিন্তায় সে বেশ চাঞ্চল্য বোধ করছে। এই ধরনের চাঞ্চল্যই বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগায়।

পরের দিনটায় সারা দিন ধরেই ঘুরে ফিরে বৃষ্টি হলো। মাঝে সামান্য একটুক্ষণের জন্য থামে, আবার ঝেঁকে ঝেঁকে আসে। ঝড় নেই অবশ্য।

তরুণ জানে, সারা দিন বৃষ্টি ভিজলে শরীরে সহ্য হবে না। কিন্তু খোকা একটানা ঘরে বসে থাকতে চায় না। সে এক একবার দৌড়ে বেরিয়ে যায়, তরুণ তাকে ডেকে আনে। সমুদ্রের ঢেউতে কখন কী উঠে আসে, তা দেখবার জন্য খোকার দারুণ কৌতূহল। অনেক সময়ই কিছু ওঠে না, কিন্তু একবার না একবার যে উঠবেই, সেই প্রতীক্ষায় বসে থাকতে তার ক্লান্তি নেই।

—তুমি যে আমায় জঙ্গল দেখাতে নিয়ে যাবে বলেছিলে?

—আজ নয়, বৃষ্টি থামুক। কাল নিশ্চয়ই আকাশ পরিষ্কার থাকবে।

—চলো না, টিলার কাছে গিয়ে দেখি, আরও কচ্ছপ উঠেছে কিনা।

—বৃষ্টিতে ভিজতে নেই রে, খোকা। আমাদের তো এখনো একটা আস্তো কচ্ছপ রয়েছে। ওটা অনেক বড়, দু'তিন দিন চলে যাবে আমাদের।

—ঐ জঙ্গলে কী আছে?

—জানি না, আমি ভেতরে যাই নি।

—আচ্ছা সব সময় এত বৃষ্টি পড়ে কেন ? আকাশেও বুঝি একটা সমুদ্র আছে ?

তরুণ হেসে ফেলে। তারপর বলে, আকাশে কী আছে, তা আমি জানি না রে, খোকা ! এই দ্বীপের বাইরে কী আছে, তা-ও আমি জানি না !

সময় কাটাবার জন্য তরুণ মাউথ অর্গানটা নিয়ে বাজাতে শুরু করে। পর পর সুর বাজিয়ে যায়। বাইরে বৃষ্টির শব্দ মিলে সেই সুর অন্য একটা রূপ পায়। সেই সুর শুনতে শুনতে তরুণের নিজেরই এক সময় ঘুম পেয়ে যায়।

এক সময় ধড়মড় করে উঠে পড়ে দেখে খোকা ঘরে নেই। তার বুকটা ধক্ করে ওঠে। এখানে দিনে বা রাত্তিরে যখনই সে ঘুমোয়, প্রতিবারই জেগে ওঠার পর তার মনে হয়, এর মধ্যে কোনো বিপদ ঘটে গেছে। অন্তত একটা কিছু পরিবর্তন হয়ে গেছে।

খোকা, খোকা বলে ডাকতে ডাকতে সে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

বৃষ্টি সমানেই পড়ে চলেছে। কাছাকাছি খোকাকে দেখা গেল না।

তরুণ সমুদ্রের ধারে চলে এলো। খোকা জলে নামতে ভয় পায়। এই দু'দিন তরুণ অনেকবার বলেও ওকে জলে নামাতে পারেনি। অর্থাৎ ও সাঁতার জানে না। ছেলেটা সমুদ্রে তলিয়ে গেল না তো ? কিন্তু...ও নিশ্চয়ই নিজে থেকে জলে নামবে না।

তরুণ ওদিক একটু ঘুরে দেখলো। যদি বেলাভূমিতে ঝিনুক খুঁজতে খুঁজতে দূরে চলে যায়। অন্য সময় বালিতে পায়ের ছাপ পড়ে। কিন্তু বৃষ্টির জন্য তারও কিছু বোঝবার উপায় নেই।

প্রথম থেকেই অবশ্য তরুণের ধারণা, খোকা টিলার দিকেই গেছে।

ঘর থেকে সে তার কুড়ুলটি নিয়ে চললো টিলার দিকে। কুড়ুলের মাথায় পাথরটা আলগা হয়ে গেছে, আবার লতা দিয়ে ওটাকে শক্ত করে বাঁধা দরকার।

প্রথম টিলাটির ওপর দাঁড়িয়ে তরুণ আবার চিৎকার করে ডাকলো, খোকা ! খোকা !

কোনো সাড়া নেই। অবিকল পিতৃ হৃদয়ের ব্যাকুলতা অনুভব করলো তরুণ। খোকার যদি কোনো বিপদ হয়, তা হলে যেন তার আর বেঁচে থাকবার কোনো কারণ থাকবে না। সে পাগলের মতন ছুটতে লাগলো এদিক ওদিক।

শেষ পর্যন্ত সে চলে এলো উপত্যকার জঙ্গলের দিকে।

একটা গোল পাথরে ঠেস দিয়ে বসে আছে খোকা। সে তার স্বরচিত তীর-ধনুক সঙ্গে এনেছিল, এখন পাশে নামিয়ে রেখেছে। কোলের ওপরে হাত, পা দুটি সামনের দিকে ছড়ানো। তার চোখ দুটি লাল, তরুণের ডাক শুনতে পেয়েও সাড়া না দিয়ে সে আপন মনে বিড় বিড় করে চলেছে।

তরুণ তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললো, তোর কী হয়েছে খোকা ? তোকে আমি বারণ করেছিলুম না, তবু তুই একলা একলা এখানে এসেছিস ?

খোকা ঘড় ঘড় গলায় জিজ্ঞেস করলো, ঐ জঙ্গলে কী আছে ?

—ওখানে ভয়ংকর প্রাণী আছে তোকে বলেছি তো ! তুই এখনো বেঁচে আছিস,

সেটাই আশ্চর্য ! ওঠ্। শিগগির ওঠ্ !

—বেঁচে না থাকলে কী হয় !

—ওসব পাকা পাকা কথা বলতে হবে না। উঠে আয় শিগগির ! খোকার গায়ে হাত দিতেই চমকে উঠলো। অস্বাভাবিক গরম। এই বৃষ্টির মধ্যেও তার চামড়া যেন পুড়ে যাচ্ছে।

—সর্বনাশ, কী কাণ্ড করেছিস !

তরুণ খোকাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দৌড়োলো। খোকার মাথাটা ঢলে পড়লো এক দিকে।

একটানা দৌড়ে এসে, ঘরের মধ্যে ঢুকে খোকাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে তরুণ হাঁপাতে লাগলো। খোকার আর কোনো সাড়া শব্দ নেই।

সন্ধের কাছাকাছি থেমে গেল বৃষ্টি। তরুণ ঠায় বসে রইলো খোকার মাথার কাছে। এ ছাড়া আর কী করতে হয় সে জানে না। মাঝে মাঝে, খোকার নিশ্বাসের শব্দও থেমে গেছে মনে হলে সে খোকার বুকে হাত দিয়ে ভয়ার্ত গলায় ডাকে, খোকা ! খোকা ! তোর কষ্ট হচ্ছে ! আমার কথা শুনতে পাচ্ছিস !

খোকা ঘোলাটে চোখ মেলে তাকায়। কোনো সাড়া দেয় না।

এক একবার সে অস্ফুষ্ট গলায় বলে, জল, জল !

তরুণ ছুটে গিয়ে তার পুকুর থেকে আঁজলা করে জল এনে খোকার মুখে দেয়। বারবার।

পরের সকালটি সোনার মতন উজ্জ্বল হয়ে এলো। আকাশের রং বালকের খুশির মতন নীল। তাপহীন রোদ্দুর ঝকঝক করছে। বাতাস খুব মনোরম। সমুদ্রও শান্ত হয়ে যেন উপভোগ করছে সেই বাতাসের বন্ধুত্ব।

খোকার জ্বর ছেড়ে গেছে অনেকটা, তবে এক রাত্তিরেই সে দুর্বল হয়ে পড়েছে বেশ। আজ আর ছুটে বাইরে যেতে চাইলো না।

খোকার চেয়েও যেন বেশী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তরুণ। মানসিক অবসাদ তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কাল রাত্রে এক সময় তার দৃঢ় ধারণা হয়েছিল, খোকা আর বাঁচবে না। এটা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিল না। মাত্র দু'দিন হলো সে এই ছেলেটিকে দেখেছে। কিন্তু এই দ্বীপে দু'দিন যেন দুটি যুগ। এরই মধ্যেই দু'জনে যেন অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে। খোকাকে ছাড়া সে এখানে আর কী করে বেঁচে থাকবে ? খোকাকে সে বাঁচাবেই বা কী করে ?

আজ বাইরে এমন সুন্দর সকাল, তবু তরুণ বাইরে না গিয়ে শুইয়েই রইলো। সে পারতপক্ষে কিছু চিন্তা করতে চায় না। চিন্তা মানেই কষ্ট। তার তো কোনো অতীত নেই। কিছু চিন্তা করতে গেলেই শুধু এই দ্বীপ, জঙ্গলের মধ্যে হিংস্র কুকুর, কাঁকড়া, কচ্ছপ এই রকম কয়েকটা জিনিস ছাড়া আর কিছু মনে পড়ে না। এই একঘেয়েমি তার অসহ্য লাগে। অথচ মানুষের মন তো সাদা থাকতে পারে না। না ঘুমিয়ে শুয়ে থাকলে

একটা না একটা কিছু মনে পড়বেই। সেই জন্য তরুণ জোর করে শুধু সমুদ্রের কথা ভাবে। অবিরাম সমুদ্রের ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে বালির ওপর। মনশ্চক্ষে এই দৃশ্যটা দেখে। ঢেউগুলো যে কতবার কতরকম বদলে যায়।

এক সময় খোকা হঠাৎ বলে উঠলো, রব্। আমার রব ছিল। সে নিশ্চয়ই কাঁদছে এখন।

তরুণ ঘাড় ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী বললি ? কে ছিল ?

খোকা বললো, রব্। রব্ আমার কুকুর। খুব ফুটফুটে সাদা লোম, বেশী বড় নয়। এই এইটুকু, সব সময়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতো।

—তোমার কুকুর ? কোথায় ছিল ?

—আমাদের বাড়িতে ?

—কোথায় সেই বাড়ি ?

—তা জানি না।

—বাড়িটা কোথায় জানিস না ! কেমন দেখতে ছিল সেই বাড়ি ? আমাদের এই বাড়িটার মতন ?

—মোটেই না। সে বাড়িটা খুব লম্বা। আমরা অনেক উঁচুতে থাকতাম।

—আমরা মানে ? আর কে ছিল সেই বাড়িতে !

—আর মনে পড়ছে না তো ! রব্ ছিল, রব্ আমার পায়ের কাছে খেলা করতো।

—ভালো করে ভেবে দ্যাখ তো খোকা ? আরও কেউ ছিল নিশ্চয়ই, তোর মা কিংবা বাবা, মনে পড়ছে না ?

—না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না !

উত্তেজনায় তরুণ উঠে বসেছে। খোকার স্মৃতি ফিরে আসছে। সে উৎসুক ভাবে চেয়ে রইলো খোকার মুখের দিকে। খোকার কিছু মনে পড়া মানেই একটা অজানা জগত খুলে যাবে তার চোখের সামনে। খোকার সঙ্গে সঙ্গে সেও তার অতীত দেখতে পাবে। হয়তো খোকার সঙ্গে তার আগে থেকেই চেনা ছিল।

খোকার চোখ আবার জলে ভরে গেল। একটু বাদে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগলো, রব্। রব্ আমায় ছেড়ে থাকতে পারে না ! রব্, তুই কাঁদছিস, আমিও কাঁদছি।

এবারে আলস্য ঝেড়ে তরুণ চলে এলো বাইরে। অপরূপ সকালটির মাধুর্য তৎক্ষণাৎ ঝাপটা মারলো তার শরীরে। সে একটুক্ষণ মুগ্ধ হয়ে চার দিক দেখে নিয়ে ডাকলো, খোকা, আয়, বাইরে দেখবি আয় !

খোকা তবু এলো না।

কয়েকবার ডাকবার পর তরুণ ফিরে গিয়ে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দেখলো, খোকা সেই রকম ভাবেই কেঁদে চলেছে।

তরুণের তখন মনে হলো, হয়তো স্মৃতি ফিরে না আসাই ভালো। এখান থেকে মুক্তি পাবার যদি কোনো উপায় না থাকে, তা হলে শুধু শুধু অতীতের কথা ভেবে লাভ কী !

তাতে দুঃখই বাড়বে।

সে নরম ভাবে বললো, আয় খোকা, বাইরে রোদ্দুরে একটু বসবি আয়, ভালো লাগবে।

খোকা উঠে এলো বটে কিন্তু অনেকক্ষণ কোনো কথা বললো না।

আবহাওয়া আজ খুবই পরিষ্কার বলে সমুদ্রের বুকে অনেক দূরে সেই কালো বিন্দুটা অনেকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

অবশ্য সেটাকে ছোট্ট একটু কালো বিন্দু ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। যেন কোনো তিমি মাছের পিঠের একটু অংশ। অন্যমনস্ক ভাবে প্যান্টের বোতাম খুলতে লাগলো তরুণ। তারপর সেটাকে সেখানে ছেড়ে রেখে সে নেমে গেল জলে। ঢেউ মৃদু হওয়ায় আজ তার স্নান করতে বেশ আরাম লাগছে। সে চলে গেল অনেকটা গভীরে। যদি ঐ কালো বিন্দুটার দিকে সাঁতার কেটে যাওয়া যায় ? সমুদ্র এরকম শান্ত হলে চেষ্টা করা যেতে পারে।

পরক্ষণেই তরুণের মনে হলো, খোকাকে ছেড়ে সে কী করে যাবে ? সে একলা গিয়ে যদি আর ফিরতে না পারে ? যতদূর মনে হয়, ওটাও আর একটা দ্বীপ। এক দ্বীপ ছেড়ে আর এক দ্বীপে গিয়েই বা লাভ কী ?

ফিরে এসে বালির ওপর শুয়ে সে গা শুকোতে লাগলো।

বিকেলের দিকে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলো খোকা। একটা কালো ভারী পর্দার সামান্য ফাঁক দিয়ে অতীতের যে-টুকু সে দেখতে পেয়েছিল তা বোধহয় আবার সে ভুলে গেছে। এখন সে আবার লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে, ঝিনুক ও পাথরের টুকরোর সঙ্গে আপন মনে কথা বলছে।

সন্ধের দিকে একটা বিপদ এলো।

ঘরের মধ্যে বসে তরুণ তখন কচ্ছপের মাংস ঝলসাচ্ছে, আর খোকা এক কোণে বসে বেসুরো ভাবে বাজাচ্ছে মাউথ অর্গানটা, এই সময় তরুণ শুনতে পেল কুকুরের ডাক।

সে উৎকর্ণ হলো। খোকাও শুনতে পেয়েছে, সে বাজনা থামিয়ে জিজ্ঞাসু চোখ মেলে রইলো তরুণের দিকে।

তরুণ ভাবলো, যদি আগের দিনের মতন কুকুরগুলো কোনো শুয়োরকে তাড়া করে আসে, তা হলে চিন্তার কিছু নেই। শুধু কুকুরগুলোকে খোলা জায়গায় আসতে সে দেখে নি এর মধ্যে। আসবার কোনো কারণও নেই, কারণ এখানে তাদের খাদ্য নেই।

কিন্তু আওয়াজ ক্রমশই এগিয়ে আসছে।

কুকুরদের যা তীব্র গতি, ওরা যদি এদিকেই আসতে চায় তো হলে এক্ষুনি এসে পড়বে।

তরুণ অতি দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো। তাদের এই ঘরটির কোনো দরজা নেই। দশ-বারোটি হিংস্র কুকুর যদি হঠাৎ এই ঘরের মধ্যে ঢুকে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তা

হলে আর বাঁচবার কোনো আশাই নেই। বরং খোলা জায়গায় তবু কিছুক্ষণ লড়া যাবে। কিংবা যদি সমুদ্রের জলে নেমে পড়া যায়—।

তরুণ তার কুডুলটা নিয়ে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই কুকুরগুলোকে সে তার ঘরের বাইরে দেখতে পেল। কিন্তু তারা তখনই ঘরের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা না করে চারপাশে ঘুরে ঘুরে গর্জন করছে।

তরুণ দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে খোকা এসে তার পিঠের আড়ালে লুকিয়েছে।

তরুণ বললো, তুই বেরুবি না, খোকা! আমি ওদের সামলাচ্ছি।

তক্ষুনি মত বদলে ফেলে সে আবার বললো, না, তুই আমার লাঠিটা নিয়ে আমার পেছনে পেছনে আয়। তোকেও লড়াই শিখতে হবে। আমি যদি মরে যাই, তোকেও তো একাই লড়াই করে বাঁচতে হবে। বেশী বে-কায়দা দেখলে ছুটে সমুদ্রে নেমে যাবি। জলে কোনো ভয় নেই। কুকুরের চেয়ে জল ভালো।

কুকুরগুলো সম্ভবত পোড়া মাংসের গন্ধ পেয়ে গেছে, তাই তারা বেশী উৎসাহের সঙ্গে লাফাচ্ছে। তরুণকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে তারা একটু যেন থমকে গেল। হয়তো তারা আগে মানুষ দেখেনি।

এ'তো আর এমন শত্রুপক্ষ নয় যে এদের সঙ্গে সন্ধির শর্ত আলোচনা করা যায়। তরুণ দ্বিধা না করে বিদ্যুৎবেগে আঘাত করলো সামনের দুটো কুকুরকে। তারপর সে তেড়ে গেল অন্যগুলোর দিকে।

যুদ্ধটা হলো অতি সংক্ষিপ্ত। কুকুরগুলো এমন আকস্মিক আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এরকম লম্বা প্রাণীর সঙ্গেও তারা আগে যুদ্ধ করে নি। তরুণের কুডুলের কয়েকটি ঘা খেয়েই ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে খানিকটা দূরে সরে গেল, তারপর তারস্বরে ডাকতে লাগলো ভয়, বিস্ময় ও রাগ মিশিয়ে।

খোকাও লাঠি বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে তরুণের পাশে। তরুণের সারা শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়। সে চিৎকার করে বললো, আয়! কাছে আয়! আয় দেখি কত সাহস!

তরুণ দু'এক পা এগিয়ে যেতেই কুকুররাও ততটুকু পিছিয়ে গেল।

তরুণ বললো, খোকা, চ্যাঁচা তো, খুব জোরে চ্যাঁচা।

তারপর দু'জনেই চ্যাঁচাতে লাগলো, হা! হা! হা!

এই রকম চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে ওরা আবার তেড়ে যেতেই কুকুরগুলো পেছন ফিরে পালালো।

খোকার পিঠে চাপড় মেরে তরুণ দারুণ উল্লাসের সঙ্গে বললো, জিতে গেছি! খোকা, আমরা জিতে গেছি!

খোকা নিশ্চয়ই তার রব এর কথা আবার একদম ভুলে গেছে, তাই সে বললো, আমি একটাকেও মারতে পারি নি।

—ওরা আবার আসবে। তোর আফশোসের কিছু নেই, আরও অনেক সুযোগ

পাবি। ওরা সহজে ছাড়বে না। আমি যদি হঠাৎ মরে যাই, তুই একা লড়তে পারবি না?

খোকা অভিমানের সঙ্গে হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললো, জানি না!

—চল, মাংস বেশী পুড়ে যাচ্ছে, আমরা খেয়ে নিই।

চট্ করে খাওয়া সেরে নিয়ে ওরা আবার বাইরে এসে বসলো।

সারা দিন যেমন সুন্দর রোদ ছিল, তেমনই ঝকঝকে জ্যোৎস্না ফুটেছে রাত্রে। সমুদ্রের ঢেউ-এর শব্দ ওদের এমনই গা-সহা হয়ে গেছে যে এই শব্দ সারাক্ষণ থাকলেও ওদের মনে হয় চারদিক বড় বেশী নিস্তব্ধ।

দু'জনে কিছুক্ষণ বসে রইলো বালির ওপরে। গল্প করার কিছু নেই। যেন মাত্র কয়েকদিন আগে ওদের জীবন শুরু হয়েছে। এক সময় খোকা সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ায় তরুণ তাকে বুকে করে ঘরে ফিরে এলো। খোকার আর জ্বর আসে নি।

আজ সাবধানতার জন্য তরুণ জ্বলন্ত গুঁড়িটাকে রাখলো দরজার কাছে। কুকুরগুলো যদি আজই রাত্রে ফিরে আসে নিঃশব্দে, তা হলে আগুন দেখে হয়তো ভেতরে ঢুকতে সাহস করবে না।

তবু তরুণের অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না। একটা কিছু অস্বস্তিতে ছটফট করতে লাগলো সে। যে দুঃখের কোনো ছবি নেই সেই রকম কোনো দুঃখ তাকে পেয়ে বসলো। দু'একবার কাতর আঃ আঃ শব্দ বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে।

এই জন্যই অন্যদিনের মতন তার আগে ঘুম ভাঙলো না। খোকা তাকে না জাগিয়ে একাই বেরিয়ে গেল, বেলাভূমি দিয়ে আপন মনে লাফাতে ফালাতে সে কুড়োতে লাগলো ঝিনুক।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে সে দৌড়ে ফিরে এসে তরুণকে খুব জোরে ধাক্কা দিতে দিতে বললো, এই, এই! শিগগির এসো! দেখবে এসো! ওঠো...!

॥ ৪ ॥

বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটি। চোখ বোঁজা। ঠিক এখানেই খোকাকে দেখেছিল তরুণ। বালি ভিজে ভিজে। রাত্রে জোয়ারের সময় এই পর্যন্ত জল এসেছিল, এখন সমুদ্র অনেক নিচে।

আজ আকাশ আবার মেঘলা, তাই রোদ নেই। ডান দিকের আকাশে মেঘ বেশ জমাট কালো, সেই ছায়া পড়েছে জলে। কালো মেঘের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কয়েকটি তুষারধবল হাঁস।

মেয়েটির গায়ের রং খোসা ছাড়ানো লিচুর মতন, সেই রকমই উজ্জ্বল মসৃণ ত্বক।

এ-ও পরে আছে একটি বোতল-সবুজ রঙের থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট, তবে এর উর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ নয়, সেখানেও ঐ রঙের জামা। খালি পা। শরীরে আর কোনো অলঙ্কার নেই, শুধু কোমরে বেল্ট বাঁধা, তার একদিকে খাপ-সমেত একটি লম্বা ছুরি। মাথার চুল ঘাড় থেকে ছাঁটা।

তরুণ আর একটি জিনিস প্রথমেই লক্ষ করলো। মেয়েটির মাথার তিন দিকে বালির ওপর কতকগুলো ঝিনুক সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ঠিক মালার মতন। মেয়েটির বুকের ঠিক মাঝখানেও একটা বেশ বড়, নীল রঙের সুন্দর ঝিনুক।

তরুণ খোকার চোখের দিকে তাকালো।

খোকা দুষ্টু দুষ্টু অপরাধী হাসি দিয়ে চেয়ে রইলো তার দিকে। অর্থাৎ মেয়েটিকে দেখা মাত্র খোকা তরুণকে খবর দিতে ছুটে যায়নি। তার আগে কিছুক্ষণ এখানে বসে ঘুমন্ত মেয়েটিকে নিয়ে খেলা করেছে।

—তুই একে চিনিস ?

—না।

—ভালো করে ভেবে দ্যাখ তো, একে আগে কখনো দেখিস নি ?

—কী জানি! মনে তো পড়ছে না। তুমি চেন ?

—আমিও মনে করতে পারছি না একে আগে কখনো চিনতাম কিনা। কিন্তু একটা জিনিস দ্যাখ, আমাদের তিনজনেরই প্যান্টের রং এক।

—হ্যাঁ দেখেছি। ওর জামা আছে, আমাদের জামা নেই কেন ?

—মেয়েদের জামা পরতে হয়। আমাদের না পরলেও চলে।

—ওকে আমি কয়েকবার ডেকেছিলুম, ও ওঠেনি। আবার ডাকবো ?

—না, থাক।

—ডাকবো না ?

—না। নিজে নিজেই ওর ঘুম ভাঙবে। হঠাৎ জেগে উঠে আমাদের দেখতে পেলে ভয় পেয়ে যাবে।

—কেন ?

—আয় খোকা, একটু দূরে বসি। তুই বেশী জোরে জোরে কথা বলিস না।

বালির ওপর বসে তরুণ ভুরু কুঁচকে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলো। তারা তিনজনই এখানে এসে পৌঁছোলো কী করে ? জলে ভাসতে ভাসতে আসা কী সম্ভব ? কোথা থেকেই বা আসবে ? যদি একই জায়গা থেকে এসে থাকে, তা হলে এতদিন পর পর এলো কেন ? পাঁচ ছ' দিন জলে ভেসেও মেয়েটি বেঁচে থাকবে কী করে ?

অথচ বেঁচে যে আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সমান নিঃশ্বাসে ঠিক এক তালে উঠছে নামছে মেয়েটির বুক। ওর বয়েস কুড়ির নিচে বলেই মনে হয়। এই মনে হওয়াটাও ওর মুখের কচি লাবণ্যের জন্য, নইলে, ওর শরীরের গড়ন বেশ ভরাট ধরনের, সাধারণ মেয়েদের চেয়ে একটু বেশী লম্বা।

খোকা ফিসফিস করে বললো, ও এসেছে, বেশ ভালো হয়েছে। আমরা বেশ তিনজন হলুম।

তরুণ চিন্তা করলো, এই কি শেষ ? না আরও কেউ আসবে! এই মেয়েটিকেও কোনো অপরাধে শাস্তি দেবার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে ? কে পাঠাচ্ছে এরকম ? কে ? কে ? কে ?

এই চিন্তাটা মন থেকে মুছে ফেলবার জন্য সে খোকার দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, কেন, আমার সঙ্গে থাকতে বুঝি তোর ভালো লাগছিল না ?

—শুধু শুধু দুজন বুঝি ভালো লাগে ?

—আগে থেকে ঠিক করে ফ্যাল, ওকে কী বলে ডাকবি। আমায় তো এই এই করিস।

—ওকে বলবো...ওকে বলবো...ও-কে আ-মি ব-ল-বো বৃষ্টি!

—ধ্যাৎ, বৃষ্টি কারুর নাম হয় নাকি!

—তা হলে বলবো ঝড়!

—পাগল ছেলে। ওকে যদি বৃষ্টি কিংবা ঝড় বলে ডাকিস, তা হলে সত্যি সত্যি বৃষ্টি কিংবা ঝড় এলে তখন তাদের কী বলছি ?

—তা হলে...তা হলে আকাশ বলি!

—কেন ?

—আকাশ তো কক্ষনো কাছে আসে না। আর আকাশকে আমরা নাম ধরে ডাকিও না।

—এমনও হতে পারে এই মেয়েটা আকাশ থেকে টুপ করে খসে পড়েছে।

—তাই তো পড়েছে। আমি দেখেছি ওর জামা প্যান্ট ভেজা নয়।

—তুই আর আমি আগের সব কথা ভুলে গেছি। ও হয়তো ভুলে যায় নি, ওর সব মনে আছে। তা হলে ওর একটা নামও থাকবে।

—ও এখনো উঠছে না কেন ?

—এই উঠবে, এক্ষুনি উঠবে।

—তুমি কী করে জানলে ?

মেয়েটির মুখে শান্ত প্রগাঢ় ঘুম। এতক্ষণের মধ্যে সে একবারও ভঙ্গি বদলায় নি। হাত দুটি দু' পাশে ছড়ানো, তার করমচা রঙের হাতের পাতা দুটি খোলা।

নিকষ কালো মেঘটি এখন ওদের মাথার ওপরে এসে পড়েছে। মেঘের ছায়ায় মানুষের মুখ বদলে যায়।

প্রথমে ঝিরিঝিরি করে খুব নরম বৃষ্টি নামলো। কয়েকবার নড়ে উঠলো মেয়েটির চোখের পাতা। তারপর সে পাশ ফিরে শুলো।

তরুণ বললো, এবার ও জাগবে। প্রথমে তোকে দেখাই ভালো। আমি দূরে সরে

যাচ্ছি। তুই ওকে বলিস, আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই।

তরুণ উঠে চলে গেল জলের দিকে। এই কয়েকদিনে ধান-কাটা মাঠের মতন রুক্ষ হয়ে গেছে তার গাল। সমুদ্রের লোনা জলের জন্য জট লেগেছে তার চুলে। তার বাদামের মতন গায়ের রঙেও সামান্য ধূসর ছোপ পড়েছে। তরুণ নিজে অবশ্য জানে না যে তার চোখের মণিদুটি নীল। আগে হয়তো জানতো, এখন সে সমুদ্রের নীলজলে নিজের মুখের ছায়া দেখতে পায় না।

আর একটু জোর বৃষ্টি আসায় যুবতী মেয়েটি উঠে বসলো। পাশ ফিরে তাকাতেই সে দেখতে পেল খোকাকে। খোকা তার খুব কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

যুবতীটি খোকাকে দেখেও মাথাটা আস্তে ঘুরিয়ে দেখে নিল চার পাশ। তরুণ নিচের দিকে নেমে গেছে বলে তাকে দেখতে পেল না। খোকার দিকে আবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো সে। তার ভুরুতে জমা হলো প্রগাঢ় বিস্ময়।

তারপরই সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য ভাষায় সে কিছু কথা বলে উঠলো।

সেই ভাষা যেন সজোরে একটা ধাক্কা মারলো খোকাকে। সেও অবাক হয়েছে কম না।

মেয়েটি আবার সেই ভাষায় কথা বলতেই খোকা একটু একটু করে পিছিয়ে যেতে লাগলো। সেই যেন ভয় পেয়ে যাচ্ছে। তার প্রত্যাশা-ব্যাকুল শিশু মনটি বড় দমে গেছে। এই মেয়েটির সঙ্গে সে কথা বলতে পারবে না?

মেয়েটি আরও কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেল মাঝপথে। তারপর সে দু' হাতে চোখ ঢেকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে ফেললো অনেকখানি। সেই অবস্থায় সে বসে রইলো খানিকক্ষণ।

তারপর আবার মুখ তুলে সে খোকার সুবোধ্য ভাষায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? আমি কোথায় এসেছি?

এবারে খোকার মুখে চমৎকার খুশী ফুটে উঠলো। সে তার চোখ দুটি আরও বড় করে দেখতে লাগলো যুবতীটিকে।

মেয়েটি আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার কথা বুঝতে পারছো না? তুমি কে? আমি···এ জায়গাটা কোথায়?

খোকা দু' দিকে মাথা নেড়ে বললো, আমি কে তাও আমি জানি না। তুমি কে তাও আমি জানি না। এই জায়গাটা কোথায় তাও জানি না।

—আমি কী করে এখানে এলাম তা তুমি জানো?

—তাও জানি না! তোমার বুঝি আগের কথা কিছু মনে নেই?

—না, আমি কিছুই মনে করতে পারছি না। কে আমাকে এখানে রেখে গেল?

—আমারও কিছু মনে নেই।

—তুমি এই দ্বীপে থাকো?

—তোমার মতনই আমি এসেছি···দুদিন, না তিনদিন আগে। এখন এখানে থাকি।

—তুমি একা?

—না, আর একজন আছে। সে কিন্তু ভালো, সে তোমায় মারবে না। সে কুকুরদের সঙ্গে দারুণ লড়াই করতে পারে। সে তোমাকে মাংস খাওয়াবে।

—আর একজন! সে কে?

—তাকে ডাকবো? তুমি ভয় পাবে বলে সে দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

—কেন, আমি তাকে ভয় পাবো কেন?

—ওর তো খুব গায়ের জোর।

—তার নাম কী?

—ওর তো কোনো নাম নেই। ওকে আমি 'এই' বলি। আমার কিন্তু নাম আছে। আমার নাম খোকা! তোমার নাম কী?

—আমার নাম···আমার নাম···তাই তো, আমার নাম তো মনে পড়ছে না। আমার নাম একটা ছিল নিশ্চয়ই।

—আমরা আগে থেকেই তোমার একটা নাম ঠিক করে রেখেছি।

—আমার নাম আগে থেকেই ঠিক হয়ে গেছে? কী নাম?

—তুমি তো আকাশ থেকে পড়েছো, তাই তোমার নামও 'আকাশ'।

এতক্ষণ বাদে মেয়েটির মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

—আমি আকাশ থেকে পড়েছি? তুই তো ভারি মিষ্টি ছেলে রে! তোর কথাটা শুনেই যে আমি আকাশ থেকে পড়লুম!

আবার একটু হেসে মেয়েটি সহসা মুখ গম্ভীর করলো। যেন হাসিটা তার পছন্দ হয় নি। এখন তার হাসবার কথা নয়।

গলার স্বরটাও বদলে সে আর্তভাবে বললো, আমার একী হলো রে? আমি কোথায় ছিলুম? এখানে কেন এলুম? কিছুই জানি না। আমি কে?

খোকা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, জোরে বৃষ্টি এসে গেছে। চলো, আমাদের ঘরে চলো।

তারপর সে চেঁচিয়ে ডাকলো, এই! এই! এদিকে এসো! আকাশ তোমায় ভয় পাবে না। এসো—।

যদি তরুণ শুনতে না পায় এই জন্য খোকা খানিকটা দৌড়ে গিয়ে আবার এই কথা জানালো।

ঢালু বেলাভূমি থেকে উঠে আসতে লাগলো তরুণ। প্রথমে দেখা গেল তার মুখ, তারপর আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ শরীর।

যুবতী মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছে। তরুণকে দেখে তার সমস্ত অঙ্গ টান টান হয়ে গেল, মুখে একটা তীব্রতার ছাপ। যেন জঙ্গলের মধ্যে অচেনা একটি বাঘকে দেখতে পেয়েছে এক বাঘিনী।

যুবতী প্রথমে তার কোমরের বেল্টে হাত দিল। তারপর ছুরিটা দেখতে পেয়ে খাপের বোতাম খুললো। সাদা রঙের হাতলটা ধরে একটুখানি বার করে দেখলো ছুরিটা। তার

চোখ দেখলেই বোঝা যায়, এই ছুরিটা কেন তার সঙ্গে রয়েছে, তা সে জানে না। ছুরিটা সেই অবস্থায় ধরে থেকে সে তরুণের দিকে তাকালো।

তরুণ গম্ভীর ভাবে বললো, ছুরিটা বার করবার দরকার নেই। বৃষ্টির জল লাগলে মরচে পড়ে যাবে। এসো আমার সঙ্গে।

—তুমি কে ?

তরুণ চার পাশে তাকিয়ে সমুদ্র, আকাশ ও ভূমি দেখে নিল একবার। তারপর বললো, কী জানি !

—এখানে আমাকে কে এনেছে ? তুমি এখানে কী করো ?

তরুণ কিছু বলবার আগেই খোকা বললো, ও এখানে কাঁকড়া আর কচ্ছপ ধরে। একটাও হাঁস ধরতে পারে নি।

তরুণ বললো, শুধু শুধু বৃষ্টি ভিজে কোনো লাভ আছে ?

চড়াং করে একবার বিদ্যুৎ ঝলকের সঙ্গে বজ্রের শব্দ হতেই মেয়েটি দারুণ চমকে উঠলো।

খোকা মেয়েটির হাত ধরে বললো, চলো, চলো, শিগগির ঘরে চলো !

মেয়েটিকে এক রকম টেনেই নিয়ে চললো সে। একটু বাদেই তাদের দৌড়াতে হলো।

ঘরটির সামনে এসে মেয়েটি সেই ঠুনকো গৃহের স্থাপত্য বা সৌন্দর্য সম্পর্কে কোনোরকম মন্তব্য করলো না। বরং থমকে দাঁড়িয়ে অভিমানী গলায় বললো, ওরা কি আমায় মেরে ফেলবে ?

খোকা জিজ্ঞেস করলো, ওরা মানে কারা ?

মেয়েটি তরুণের দিকে খর চোখে তাকিয়ে বললো, তুমি কি ওদের লোক ?

তরুণ বললো, আমি এই খোকা ছাড়া আর কোনো মানুষকেই চিনি না।

মেয়েটি তবু বললো, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না !

তরুণের মনে হলো, জ্ঞান ফিরে পাবার পর মেয়েটির কিছুক্ষণ একেবারে একা থাকা উচিত ছিল। যেমন সে নিজে ছিল। খোকা ছিল। পূর্ব স্মৃতি খুঁজে পাচ্ছে না বলে মেয়েটি এখনো কাঁদবার সুযোগ পায় নি।

ঘরের মধ্যে ঢুকে মেয়েটি চারদিকে একবার চোখ বুলোলো। তার মনঃপূত হয় নি। হবার কথাও নয়। কাঠের গুঁড়িটা পুড়ে পুড়ে এক গাদা ছাই জমে আছে একদিকে। কাল রাত্তিরে কচ্ছপের মাংসের হাড়টাড়ও পরিষ্কার করা হয় নি। সারা ঘরে অনেক শুকনো পাতা ছড়ানো, সেই পাতাই ওদের শয্যা।

মেয়েটি ধুপ করে বসে পড়লো একদিকে। তারপর কালো চোখ দুটি বিস্ফারিত করে ভয়-পাওয়া পশুর মতন দেখতে লাগলো পুরুষ ও বালকটিকে।

তরুণ দরজার কাছে উঠে গিয়ে মনে মনে মেপে দেখলো বাইরের বৃষ্টি। বেশ বড়

বড় ফোঁটা পড়ছে, তার মানে বেশীক্ষণ থাকবে না। আজ সিন্ধু সারসের সংখ্যা যেন কিছু বেশী। কয়েকটি ঢেউ-এ দোল খাচ্ছে, কয়েকটি উড়ছে আকাশে। রাত্রে ওরা জঙ্গলের দিকে উড়ে যায়।

তরুণ ভাবলো, জঙ্গলের মধ্যে ঢোকা না গেলেও সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে হেঁটে জঙ্গলের অন্য পাশটা তো অনায়াসেই ঘুরে দেখে আসা যায়। আজই যেতে হবে।

বৃষ্টি থেমে যেতেই মেয়েটি বললো, আমি এই ঘরে থাকবো না।

খোকা বললো, তা হলে কোথায় থাকবে ? আর তো ঘর নেই, তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।

মেয়েটি ধমক দিয়ে বললো, না থাকবো না ! তোমাদের ঘরে কেন থাকবো ? তোমরা আমার কে ? আমার যেখানে খুশী সেখানে থাকবো।

—কুকুর আছে। তোমায় কামড়ে দেবে !

—কুকুর ?

তরুণ মুখ ফিরিয়ে শান্ত গলায় বললো, তোমার যেখানে খুশী সেখানে থাকতে পারো। তবে, এখানে ঘন ঘন বৃষ্টি হয়, সেই জন্য ঘর একটা বানিয়ে নিতেই হবে। আর একটা ব্যাপারে তোমাকে সাবধান করে দেওয়া আমাদের কর্তব্য। এখানকার জঙ্গলে হিংস্র কুকুর আছে, তারা দল বেঁধে তাড়া করে। আরও কোনো হিংস্র জানোয়ার আছে কি না আমরা জানি না। সুতরাং জঙ্গলের মধ্যে একা একা না-যাওয়াই ভালো।

মেয়েটি বললো, তা হলে আমি জঙ্গলেই যাবো !

তরুণের পাশ দিয়ে তরুণকে প্রায় ঠেলে সে বেরিয়ে গেল বাইরে। তারপর বেশ জোরে জোরে হাঁটতে লাগল টিলার দিকে।

খোকা তরুণের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বললো, ওকে যদি কুকুরে খেয়ে ফেলে ?

—ওকে বারণ করলুম তো, শুনলে না !

—তোমার তো গায়ের জোর আছে, তুমি ওকে জোর করে ধরে নিয়ে এসো না !

—না !

খোকা চেঁচিয়ে ডাকলো, এই আকাশ ! আকাশ ! শোনো, তুমি আমাদের একটা লাঠি নেবে ?

মেয়েটি সে ডাকে ভ্রূক্ষেপও করলো না।

খোকা একটা লাঠি হাতে নিয়ে ছুটে গেল মেয়েটির দিকে। তরুণ এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো সেদিকে। খোকা মেয়েটির পাশে পাশে দৌড়ে দৌড়ে কী যেন বোঝাবার চেষ্টা করছে তাকে। মেয়েটি রাগত ভাবে হাত নেড়ে না বলছে।

তরুণের ঠোঁটে সামান্য হাসি ফুটে উঠলো। সে ভাবলো, মেয়েটি যদি আলাদা একটি ঘর তৈরি করে তা হলে খোকা কোথায় থাকবে ? সেখানে, না তার কাছে ? এর মধ্যেই খোকার স্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব মেয়েটির দিকে।

কিন্তু এখন, মেয়েটি যদি সত্যিই জেদ করে জঙ্গলের মধ্যে ঢোকে, খোকাও ওর সঙ্গে যাবে নিশ্চিত। তা হলে কি তরুণেরও ওদের পেছনে যাওয়া উচিত নয় ? অথচ তার মনের মধ্যে কিসের যেন একটা বাধা রয়েছে। মেয়েটি তার সাহায্য চায় না। কিন্তু খোকা ? খোকাকে কি সে বিপদে পড়তে দিতে পারে ?

তবু তরুণ গেল না। ঘর থেকে বেরিয়ে গোল-পাতা গাছটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। বৃষ্টি থেমে যাবার পর চারদিকটা বেশ ছলছলে দেখায়। হাঁসগুলি মাঝে মাঝে জলপরীদের মতন উঁচু হয়ে উঠে ডানা ঝাড়ছে।

একটু বাদেই খোকার আকাশ ফাটানো চিৎকার শোনা গেল।

—এই, শিগগির এসো ! এই ! আমরা মরে যাচ্ছি ! শিগগির এসো— !

বিদ্যুতের মতন গতিতে ঘর থেকে কুড়ুলটা এনেই তরুণ ছুটলো। মনে মনে সে ভাববার চেষ্টা করছে, ওদের কী বিপদ হতে পারে। ওখানে কুকুরের পাল লুকিয়ে ছিল ? অন্য কোনো হিংস্র প্রাণী ? কিংবা ওদের মধ্যে কেউ গড়িয়ে পড়ে গেছে ?

একটা পাথরের আড়াল ঘুরতেই তরুণ ওদের দেখতে পেল।

মেয়েটি মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে আর খোকা ওর পা দুটো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আছে। মেয়েটি ওঠবার চেষ্টা করে যাচ্ছে, সে একবার করে উঠে বসতেই খোকা তাকে আবার শুইয়ে ফেলছে আর খলখল করে হাসছে।

তরুণ ওদের কাছে এসে ধমক দিয়ে বললো, এই খোকা, কী করছিস ?

মেয়েটি রাগী গলায় বললো, তোমার এই ছেলেটি...ও খুব অসভ্য !

খোকা মেয়েটির পা ছেড়ে দিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললো, ও কেন চলে যাবে ? না. ও চলে যাবে না ! ওকে আমরা যেতে দেবো না !

তরুণ বললো, ও যদি একা থাকতে চায়, তুই আটকাবি কেন ?

মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। তার চোখে এখনো ধাঁধা লেগে আছে।

খোকা জিজ্ঞেস করলো, তুমি সত্যিই একা থাকতে চাও ?

মুখ না ফিরিয়ে মেয়েটি কঠিন ভাবে বললো, হ্যাঁ।

—কেন ? একা থাকতে কারুর ভালো লাগে ? তোমার ভয় করবে না ?

মেয়েটি এবার খোকার দিকে ফিরে, খানিকটা নিচু হয়ে ঝুঁকে অস্বাভাবিক তীব্র গলায় বললো, আমি থাকতে পারি তোমাদের সঙ্গে—তার আগে সত্যি করে বলো, তোমরা কে ?

খোকা তাকালো তরুণের দিকে। তরুণ দেখলো মেয়েটিকে। কোনো কথা বললো না। এবার ওরা পরস্পরের মুখের অসহায় ভাষা পড়তে পাড়লো।

তরুণ একটু বাদে বললে, তোমাকে আমরা এই দ্বীপ সম্পর্কে কিছু খবর জানাতে পারি শুধু, এ ছাড়া তোমাকে জানাবার মতন আর কিছুই নেই আমাদের।

মেয়েটির মুখে ফুটে উঠলো দারুণ কষ্টের ছাপ। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে তার মাথার

চুল চেপে ধরলো বাঁ হাতে। সূর্যের দিকে তাকিয়ে সে বললো, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে ! আমার একটুও ভালো লাগছে না।

খোকার মুখটা শুকিয়ে গেছে। সে এক দুর্বোধ্য ভয়ে ভুগছে। এই চমৎকার জায়গাটা এই অদ্ভুত মেয়েটির কেন ভালো লাগছে না ? কিছু একটা বলতে হবে বলেই যেন সে বললো, আমার জল তেষ্টা পেয়েছে।

তারপর সে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে মেয়েটির উরুতে হাত রেখে কাতর গলায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি সত্যিই চলে যাবে ?

মেয়েটি কোনো উত্তর না দিয়ে পাগল পাগল ভাবে আধা-দৌড়ে চলে গেল সমুদ্রের দিকে। তারপর হাঁটু পর্যন্ত জলে নেমে ধপাস করে বসে পড়লো সেখানে। যেন সে সেখানেই বসে থাকবে, কোনো এক সময় ঢেউ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আপাতত ছোট ছোট ঢেউ তাকে দোলাতে লাগলো। যেন সেও একটি সিন্ধু সারসী।

তরুণ মেয়েটির ঐ রকম ব্যবহারে চিন্তিত হলো না। সাধারণত সমুদ্র কিছু নেয় না, ফিরিয়েই দেয়।

সে খোকাকে বললো, তুই জল খেয়ে আয়। তারপর আমরা আজ অনেক দূরে বেড়াতে যাবো।

খোকা পাঁই পাঁই করে ছুটে চলে গেল ঘরটার দিকে। একটু বাদেই সে ফিরে এলো মাউথ অর্গান বাজাতে বাজাতে।

সে বাজনা শুনে তরুণী মেয়েটি একবার চমকে মুখ ফিরিয়ে দেখেই আবার মনোযোগ দিল সমুদ্রের দিকে।

খোকা কাছে এসে তরুণকে বললো, ও যাবে না আমাদের সঙ্গে ? ওকে একলা ফেলে রেখে যাবো ?

—ও যাবে কিনা জিজ্ঞেস কর।

খোকা সমুদ্রের কাছে গিয়ে জোরে বললো, এই আকাশ, বেড়াতে যাবে ?

তারপর সেই কথাটাই বাজাবার চেষ্টা করলে মাউথ অর্গানে।

দু'তিনবার ডাকেও ভ্রূক্ষেপ করলো না মেয়েটি। খোকা জলের কিনারায় চলে গেল। সে জলে নামতে ভয় পায়। পায়ের পাতা-ভেজানো জলে দাঁড়িয়ে সে মিনতি করে বললো, এই আকাশ, চলো না !

এবারে মেয়েটি উঠে এসে বললো, এই, তুই নিজে জল খেলি, আমায় খাওয়ালি না ?

—চলো ! আমাদের পুকুর আছে। আমাদের পুকুরে একটা মাছ ছিল, সেটা মরে গেছে।

—তারপর সেই মাছটা কী করলি ?

—খেয়ে ফেললুম। তুমি যদি মরে যাও, তোমাকেও আমরা খেয়ে ফেলবো।

—আঁ !

—হি-হি-হি-হি

বালকের হাসির মধ্যে একটা খটখটে শব্দ থাকে। খোকা নিজের কথাটাকে খুব উপভোগ করে হাসতে লাগলো দুলে দুলে।

যুবতী খোকার কাঁধে হাত রেখে বললো, তুই মহা পাকা ছেলে।

সেই অবস্থায় দু'জনে কথা বলতে বলতে ফিরে চললো ঘরের দিকে। খোকা একবার পেছন ফিরে তরুণের দিকে হাত তুলে বললো, আসছি!

॥ ৫ ॥

ফট্ করে একটা শ্যাম্পেনের বোতল খোলার শব্দ হলো। খুব পাতলা কাচের গেলাসে ঢালা হলো সেই সফেন পানীয়। একজন পুরুষ গম্ভীর গলায় বললো, আমাদের নিরীক্ষণের সার্থকতার কামনায়—।

পাঁচজন পুরুষ ও রমণী তাঁদের ওষ্ঠে গেলাস ছোঁয়ালেন।

আকাশের একটি গবেষণা যানে বসে আছেন এঁরা। যানটি গতিহীন অবস্থায় শূন্যে ভেসে আছে। ইংরেজি ভি অক্ষরের আকারে তিনটি তিনটি আসন দুদিকে সাজানো। এর মধ্যে একটি আসন খালি। বাঁ দিকের তিনটি আসনে বসে আছেন দু'জন পুরুষ ও একজন নারী, নারীটি মাঝখানে, এঁরা তিনজনেই বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, এঁদের নাম প্রথম, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়। ডান দিকে একজন পুরুষ ও নারী, এঁরা বিশেষজ্ঞ। এঁদের নাম ব্যক্তি ও মহাশয়া।

ব্যক্তিটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, মুখে চাপ দাড়ি, সেই তুলনায় মাথার চুল পাতলা, প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়েস, চক্ষু দুটি উদাসীন ধবনের। এক একজন মানুষ থাকে যাদের মুখের দিকে তাকালেই ভালো লাগে, ইনি সেইরকম। ইনি প্যান্ট ও কোট পরে আছেন, কিন্তু সেই পোষাক ঢিলেঢালা, গলায় টাই নেই, তার বদলে একটা গাঢ় নীল রঙের মাফ্লার এক একবার গলায় জড়াচ্ছেন, আবার খুলে রাখছেন। মাঝে মাঝে জামার বোতাম খুলে ইনি হাত বুলোচ্ছেন নিজের বুকে। ইনি একজন কবি এবং শুধু কবিতা লেখাই এঁর জীবিকা। এই গবেষণা কেন্দ্রে আমন্ত্রণ পেয়ে ইনি অবাক হয়েছিলেন, তবে সানন্দে গ্রহণও করেছেন। এখানে কতদিন থাকতে হবে তার কোন ঠিক নেই। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা বেশ ভালোই।

মহাশয়ার বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি, গৌরাঙ্গী, মুখখানা তীক্ষ্ণ ধরনের। টানা টানা চোখ, টিকলো নাক, থুতনিটাতে মনে হয় কোনো কুমোরের একটু বেশী বেশী যত্নের ছোঁয়া আছে। এঁর চুল শিঙ্গল করা, একটু কোঁকড়া ধরনের। ইনি পরে আছেন সাদা রঙের প্যান্টস্ ও সাদার ওপর গোলাপি-গোলাপি ছাপ ছাপ জামা। সমস্ত বিচারে এঁকে

বেশ সুশ্রী বলা উচিত কিন্তু এর চোখের দৃষ্টিতে সব সময় একটা সন্দেহের আভাস থাকে বলে এঁর দিকে সরাসরি তাকিয়ে থাকা যায় না। পঙ্গু ও জড়-বুদ্ধি ছেলে-মেয়েদের জন্য খুব বড় একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ইনি পরিচালিকা।

বৈজ্ঞানিক তিনজনেরই বয়েস পঁয়তিরিশের মধ্যে, খেলোয়াড়-সুলভ মজবুত স্বাস্থ্য, তিনজনেই পরে আছেন বোতল-সবুজ রঙের প্যান্টস্ ও জামা।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে সম্প্রতি নির্দেশ জারি হয়েছে যে, যে-কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণার সময় অন্তত একজন-দু'জন করে অ-বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ রাখতেই হবে। কারণ বৈজ্ঞানিকরা শুধু তত্ত্বের নেশাতেই অনেক সময় এগিয়ে যায়, মানুষের কথা, এই বিশ্বের মঙ্গল ও কল্যাণের কথা তাঁদের মনে থাকে না। একজন কেউ বারুদ আবিষ্কার করলে পরবর্তী বৈজ্ঞানিকটি ভাবেন আরও কত সাংঘাতিক বারুদ আবিষ্কার করা যায়। তাঁরও পরবর্তীজন ভাবেন, কত সহজে কত বেশী বিপজ্জনক কাজে এই বারুদের ব্যবহার করা যায়। এই রকম আর কি! সেই সূত্র ধরেই এসেছে প্রথমে পরমাণু বোমা, তারপর হাইড্রোজেন বোমা, তারপর নিউট্রন বোমা···।

কিছুদিন আগে প্রোটো-নিউট্রন বোমার আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিকটিকে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, এই যে মহা সাংঘাতিক অস্ত্র, যার একবার মাত্র প্রয়োগে পৃথিবীর এক দশমাংশ কয়েক মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, এটা আপনি আবিষ্কার করলেন কেন? এতে আপনার কী আনন্দ হলো? এর উত্তরে বৈজ্ঞানিকটি সরল বিস্ময়ে বলেছিলেন, কেন? আমার আগে কেউ এই তত্ত্বটি বুঝতে পারে নি, অনেকেই বলেছিল, এটা অসম্ভব। কিন্তু আমিই এটা পরীক্ষা করে দেখাতে সক্ষম হয়েছি, এটাই আমার আনন্দ!

এই গবেষণা কক্ষটিতে রয়েছে দু' দিকের দুটি দেয়াল জোড়া টি ভি পর্দা। চেয়ার ঘুরিয়ে ইচ্ছে মতন যে-কোনো দিকে দেখা যায়। আপাতত একটি টি ভি পর্দায় দেখা যাচ্ছে একটি দ্বীপের ছোট্ট ঘরটিতে বসে আছে তরুণ, খোকা ও যুবতী মেয়েটি। বাইরে তুমুল বৃষ্টি। খোকা মাউথ অর্গান বাজাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে দ্বিতীয়া বললেন, এ পর্যন্ত তো আমাদের পরীক্ষা পুরোপুরি সার্থক। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ীই সব কিছু ঠিকঠাক এগোচ্ছে। মহাশয়া, আপনার গেলাশ খালি, আপনি আর একটু শ্যাম্পেন নিন্?

ব্যক্তিকে অবশ্য অনুরোধ করার দরকার হয় নি, তিনি এর মধ্যেই নিজেই হাত বাড়িয়ে সামনের টেব্‌ল থেকে বোতলটি নিয়ে তিনবার নিজের গেলাশ ভরেছেন।

তৃতীয় বললেন, মহাশয়া, অনেক দেরিতে এসেছেন, উনি প্রথমটা জানেন না। ভি ডি ও-তে ওঁকে আগের দৃশ্যগুলো দেখিয়ে দেওয়া দরকার।

মহাশয়া বললেন, আমি কুরিয়ার সার্ভিসে খবর পাঠিয়েছিলুম যে আমার আসতে কয়েকদিন দেরি হবে। আপনারা সে খবর পান নি?

—হ্যাঁ, পেয়েছিলুম। কিন্তু আমাদের পক্ষে তখন আর পিছিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এক নম্বর সাবজেক্টকে ততক্ষণে রওনা করিয়ে দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য ভি

ডি ও দেখলেই আপনি আগেরটা সব বুঝে যাবেন।

মহাশয়া বললেন, আমার ব্লাড প্রেশার ঠিক এক জায়গায় আনবার জন্যই কয়েকদিন দেরি হয়ে গেল। আশি-একশো কুড়ি স্থির ব্লাড-প্রেশার না হলে তো এখানে আসা যায় না। আমার কিছুটা বেশী ছিল।

ব্যক্তি বললেন, মহাশয়া, এই জায়গাটা কিন্তু চমৎকার। এখানকার কৃত্রিম আবহাওয়াতে শরীর খুব সুস্থ থাকে। আমি তো এই কয়েকদিনেই যুবকের মতন বোধ করছি। অবশ্য, তুমি তো যুবতীই।

মহাশয়া বললেন, আপনিও তো মনে মনে একজন যুবক।

—এখানে যা খুশী খাবে, খুব সহজেই হজম হয়ে যায়। সামুদ্রিক অ্যাসপারাগাসের একটা স্যুপ এরা এখানে বানায়। তেমনটি আমি আগে কখনো খাইনি। কাল রাত্তিরে অনেকখানি ক্যাভিয়ের খেলুম, একেবারে টাট্কা, একবারও চোঁয়া ঢেঁকুর উঠলো না।

মহাশয়া প্রকাশ্যে এবং বৈজ্ঞানিক তিনজন মুখ লুকিয়ে হাসলেন। পান-ভোজন বিষয়ে কবির দুর্বলতার কথা সবাই জানে। ইনি অতি সূক্ষ্ম রসের কবিতা রচনা করলেও অকবিত্বময় কথাবার্তা বলার জন্যও বিখ্যাত।

দু' বার বেশ জোরে বজ্রপাতের শব্দ হলো, এখানে নয়। টি ভি'র ছবিতে। কুঁড়ে ঘরটির মধ্যে খোকা গুটিসুটি মেরে হাঁটু দুটো চেপে ধরে বসে ঢুলছিল, বজ্রের শব্দে ভয় পেয়ে সে সরে এসে যুবতীর গা ঘেঁষে বসলো।

প্রথম বৈজ্ঞানিক মহাশয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাদের এই নিরীক্ষণের পটভূমিকা জানেন তো?

মহাশয়া বললেন, পরিবেশ ও আবহাওয়া সংরক্ষণ কমিটির সম্পাদকের চিঠিতে খানিকটা জেনেছি। আপনারা আরও একটু বিস্তৃত ভাবে বললে ভালো হয়।

—তা হলে এক কাজ করা যাক। দ্বিতীয়া এখানে কবিকে নিয়ে বর্তমান ঘটনাটা অনুসরণ করুক। আপনাকে নিয়ে আমি আর তৃতীয় বরং কয়েকদিন অতীতে পিছিয়ে যাই। তা হলে আপনার বুঝতে সুবিধে হবে। চলুন, আমরা পাশের ঘরে যাই।

দ্বিতীয়াকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে প্রথম ও তৃতীয় পাশের ঘরে যেতে উদ্যত হতেই ব্যক্তি বললেন, শ্যাম্পেনের বোতলটা···ওটা কি তোমরা নিয়ে যাবে, না এখানেই থাকবে?

মহাশয় বললেন, বোতলটাতে তো আর বাকি কিছু রাখেন নি।

তৃতীয় বললো, যেটুকু আছে, আপনার কাছেই থাক। তবে, দেখবেন, যেন ঘুমিয়ে পড়বেন না!

ব্যক্তি বললেন, দ্বিতীয়া রয়েছে···একলা এক তরুণীর পাশে ঘুমিয়ে পড়বো, আমি কি এতই বে-রসিক! দ্বিতীয়া খুব ভালো, দরকার হলে সে আমাকে আরও শ্যাম্পেন এনে দেবে! তাই না, দ্বিতীয়া?

পাশের কক্ষটি ছোট। এখানেও এক দেয়াল জুড়ে টি ভি পর্দা। অন্য তিনটি দেয়াল

স্বচ্ছ, সেখান দিয়ে অসীম নীল আকাশের বিস্তার দেখা যায়। এক খণ্ড পাতলা সাদা মেঘ একদিকের কাচে ধাক্কা মেরে যেন ভেতরে ঢুকতে চাইছে।

তৃতীয় ভি ডি ও টেপ লাগাতে নিযুক্ত হলো। মহাশয়া প্রথমকে জিজ্ঞেস করলেন, এখানে সিগারেট খাওয়া যেতে পারে?

প্রথম বললেন, হ্যাঁ, তবে সারা দিন রাতে গুণে গুণে ঠিক পাঁচটার বেশী নয়। সিগারেটে বড্ড অক্সিজেন খরচ হয়।

—আপনাদের এখানে নিশ্চয়ই রি-সাইক্লিং-এর ব্যবস্থা আছে?

—তা আছে, তবু বড্ড চাপ পড়ে। আমাদের কবিটি অবশ্য মানতে চান না, মাঝে মাঝেই ফস্ করে চুরুট ধরিয়ে ফেলেন।

—আমি চুরুটের ধোঁয়া সইতে পারি না। ওঁকে ওটা বন্ধ করতে হবে।

—কবি বড় মজার লোক। ওঁকে বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক হিসেবে এখানে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু উনি প্রায়ই ঘুমে ঢুলে পড়ছেন কিংবা বেশী নেশা করে ফেলছেন—কতটা যে মন দিয়ে দেখছেন তা বলতে পারি না।

সিগারেট ধরিয়ে, এক পায়ের ওপর আর এক পা তুলে দিয়ে, ডান উরুর কাছে কুঁচকে থাকা পোষাক হাত দিয়ে প্লেন করে মহাশয়া বললেন, যাঁরা কল্পনাশ্রয়ী শিল্প নিয়ে কারবার করেন, তাঁরা, আমি যতদূর শুনেছি, এক ঝলক দেখে নিলেই অনেক কিছু বুঝতে পারেন। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য, আমাদের মতন ওঁদের সব সময় মনোযোগ দেবার দরকার হয় না। ওটাই ওঁদের প্রতিভা।

—তা হতে পারে অবশ্য!

এইসময় টি ভি পর্দায় ছবি ভেসে উঠলো। ঘর অন্ধকার করে দিল তৃতীয়।

সমুদ্রের ঢেউ ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে বেলাভূমি। আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ। বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে আছে তরুণ। চক্ষু দুটি বোঁজা। প্রথম দৃশ্য।

প্রথম বললেন, তৃতীয়, তুমি প্রয়োজনীয় জায়গাগুলো রেখে মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে যেও। সব তো দেখা সম্ভব নয়। মহাশয়, আপনি দেখতে পাচ্ছেন সাবজেক্ট নাম্বার ওয়ানকে। একটি নির্জন দ্বীপে তাকে প্রথমে একা পাঠানো হয়েছে। কেন পাঠানো হয়েছে জানেন নিশ্চয়ই?

হাত-ব্যাগ থেকে একটা ছোট প্যাড ও পেন্সিল বার করে মহাশয় বললেন, হ্যাঁ। মানব-সভ্যতার বিবর্তনের ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। তাই তো?

—সেই রকমই বলা হয়েছে। এর পেছনে আর একটা গভীর কারণও আছে। হয়তো, খুব শিগগিরই মানুষকে আবার এই রকম অবস্থায় সত্যি সত্যি পড়তে হবে। তখন, আবার প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে মানুষ জাতি টিঁকে থাকতে পারবে কি না, সেটা দেখাই আসল উদ্দেশ্য।

—মানুষকে আবার এই রকম অবস্থায় পড়তে হবে...কেন?

—মহাশয়, খুব সম্ভবত আজ থেকে এক বছর পরে আপনি বা আমি কেউ-ই বেঁচে

থাকবো না। মানুষ জাতির অন্তিম কাল ঘনিয়ে এসেছে। প্রাচীন কাল থেকে অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে ১৯৯৯ সালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। আজ ১৯৯৮ তে মনে হচ্ছে সেটা কিছুই অসম্ভব নয়। মানুষের হাতেই আজ যে অস্ত্র জমেছে, তা দিয়ে এই পৃথিবী তিনবার ধ্বংস করা যায়। এবং সে অস্ত্র নিবারণ করার সাধ্যও এখন আর মানুষের নেই।

—১৯৯৯ সালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে ? আবার কী গাঁজাখুরি কথা বলছেন ? আপনারা কি বৈজ্ঞানিক না জ্যোতিষী ?

সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে প্রথম চেয়ে রইলেন মহাশয়ার দিকে। তারপর বললেন, এটা আমার অভিমত বা ভবিষ্যৎ গণনা নয়। অন্যদের কথা। নস্ট্রাডেমাস নামে ষোড়শ শতাব্দীর এক ফরাসী কবির নাম আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই। ইনি বলে গিয়েছিলেন যে, ১৯৯৯ সালের সপ্তম মাসে আকাশ থেকে এক মহা বিপদ নেমে আসবে, তাতেই মানুষের সর্বনাশ হবে।

বিরক্তিসূচক বিস্ময়ে মহাশয় বললেন, কী ব্যাপার তা তো বুঝতে পারছি না। আপনারা কি ঠাট্টা করবার জন্য আমাকে এখানে ডেকেছেন ? একজন কবির কবিতার আমরা তারিফ করতে পারি, কিন্তু তার উদ্ভট কথাবার্তায় আমরা গুরুত্ব দেবো কেন ?

কবি উচ্চহাস্য করে বললেন, তুমি ঠিক বলেছো মহাশয়া, কবিদের এরকম অনেক পাগলামি থাকে।

প্রথম একটুক্ষণ চুপ করে থেকে ওঁদের দু'জনকে কথা বলতে দিলেন। তারপর আবার বিনীতভাবে বললেন, ষোড়শ শতাব্দীর এই কবি নস্ট্রাডেমাস কিন্তু ভবিষ্যতের ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়নের পতন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনা, হিটলার ও রুজভেলট সম্পর্কে অপ্রত্যক্ষ উক্তি এমনকি পরমাণু বোমারও উল্লেখ করে গেছেন। সে যাই হোক, তবু এসব কোনো কবির পাগলামি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। ওল্ড টেস্টামেণ্টে নিশ্চয়ই আপনি পড়েছেন যে ইহুদিরা যখন তাদের প্রাক্তন হোমল্যাণ্ডে আবার রাজ্যস্থাপন করবে, তার এক পুরুষ পরেই বিশ্বে মহা বিপর্যয়কর এক যুদ্ধ বাধবে। যাকে ওরা বলেছে আর্মাগেডন। নিউ টেস্টামেণ্টেও আছে যে যীশু বলেছেন, জেরুজালেমকে যখন চতুর্দিক থেকে শত্রুরা ঘিরে ধরবে, তখনই চরম বিচারের দিন আসবে।

—আপনি বাইবেলের দোহাই দিচ্ছেন ?

—আরও শুনুন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে আছে যে বৌদ্ধ ধর্ম আড়াই হাজার বৎসর পরে শেষ হয়ে যাবে। তখন পৃথিবীর রূপান্তর ঘটিবে, আসবেন মৈত্রেয়। এই শতাব্দীতেই ঐ ধর্মের আড়াই হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে। তিব্বতের বৌদ্ধদেরও বিশ্বাস ছিল যে ত্রয়োদশ দালাই লামার পর ওদের ধর্ম শেষ হয়েব। ত্রয়োদশ দালাই লামার পতন হয়ে গেছে। আদি মুসলমানদের বিশ্বাস যে মানুষ চাঁদে পা দিলে ঐ ধর্মের শেষ হয়ে যাবে। সে রকম কি ঘটেনি ? তা ছাড়া ইসলামের প্রবর্তনের চোদ্দ শো বছর পর মহা সংকট আসবে, এমনও বলা ছিল। হিন্দুদের বিশ্বাস, কলি যুগের শেষে কল্কি অবতার এসে

পৃথিবী ধ্বংস করবে। ওঁদের গণনা অনুযায়ী কলি যুগ পূর্ণ হয়ে গেছে। মিশরের গিজা পিরামিডের অভ্যন্তরের নির্দেশ অনুযায়ী পৃথিবীর আয়ু ২০০১ সাল পর্যন্ত। ইংলণ্ডে মাদার শিপটন আরও অত্যাশ্চর্য কথা বলে গেছেন যে, যখন মেয়েরা ছেলেদের মতন পোষাক পরবে, এবং মাথার চুল ছোট করে ছাঁটবে...

—এসব কী শোনাচ্ছেন আপনি ? আমরা কি এখানে ধর্ম চর্চা করতে এসেছি, না বিজ্ঞান-গবেষণা প্রত্যক্ষ করতে, সত্যি করে বলুন তো ?

—আমরা বৈজ্ঞানিক, এখানে আমরা বিজ্ঞান-গবেষণার জন্যই এসেছি। আপনারা তার পর্যবেক্ষক। তবে, বিজ্ঞানের ভয়াবহ রূপটি দেখে পাছে আমরা ধর্ম শাস্ত্রের কাছে সান্ত্বনা খুঁজতে যাই, সেই জন্য ঐ তথ্যগুলি আগে বলে নিলুম। বিজ্ঞান এখন মানুষের হাতে গড়া দৈত্য, এর থেকে নিস্তার পাবার সাধ্য আর মানুষের নেই।

তৃতীয় বললেন, বিবর্তনবাদের নিয়তিই বোধ হয় এই। পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত প্রাণীকে পরাজিত করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। সারভাইভাল অফ দা ফিটেস্ট-এর নিয়ম অনুযায়ী মানুষই এই পৃথিবীর প্রভু। কিন্তু মানুষ নিজেকে জয় করতে পারে নি। মানুষের আর কোনো শত্রু নেই, সেই জন্য এবার মানুষ নিজেই নিজেকে হত্যা করবে।

মহাশয় বললেন, এসব তো আপনি দার্শনিকতার কথা বলছেন।

তৃতীয় বললেন, প্রকৃত তথ্যও সেই কথাই বলে। আপনি জানেন নিশ্চয়ই যে ১৯৭৮ সালে এই পৃথিবীর মাত্র ছ'টি দেশের হাতে পরমাণু-অস্ত্র ছিল। তারপর এই কুড়ি বছরের মধ্যে আরও সতেরোটি দেশ এই অস্ত্রের অধিকারী হয়েছে। এ ছাড়া আরও পাঁচটি দেশ যে-কোনো মুহূর্তে এই অস্ত্র বানাতে পারে। যাই হোক, অন্য দেশের কথা না হয় বাদ দিন, যদিও বাদ দেওয়া উচিত নয়, কারণ এর মধ্যে যে-কোনো একটি দেশ হঠাৎ যুদ্ধ লাগাতে পারে। পৃথিবীর সব চেয়ে বৃহৎ দুটি দেশের হাতে আছে সাতাশ হাজার ও সাড়ে ছাব্বিশ হাজার মেগাটন টি এন টি পরমাণু-অস্ত্র শক্তি। এতটুকু একটা পৃথিবীকে উড়িয়ে দিতে তো এত অস্ত্র লাগে না।

প্রথম বললেন, একটা মাত্র ভুল, যে-কোনো উন্মাদের একটা মাত্র ভুলের জন্যই ধ্বংস শুরু হয়ে যেতে পারে। পৃথিবীর যে-কোনো দেশ থেকে একটি পরমাণু-অস্ত্রবাহী রকেট আকাশে ওড়া মাত্র অন্য রকেটগুলি আপনা আপনি চালু হয়ে যাবে। আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে কয়েক মুহূর্ত শুধু আলোর উৎসব দেখবো, তারপরই সব শেষ।

—এত মৃত্যুর কথা চিন্তা না করাই ভালো। মৃত্যু যেদিন আসবে সেদিন দেখা যাবে।

—মহাশয়, এ তো ব্যক্তিগত মৃত্যুভয় নয়। ব্যক্তিগত ভাবে কেউ কেউ মনে মনে মৃত্যুকে জয় করতে পারে। শান্তভাবে, এমনকি হাসিমুখেও মেনে নিতে পারে মৃত্যুকে। কিন্তু এ যে সমস্ত মানুষ জাতির অবলুপ্তির প্রশ্ন।

—সমস্ত মানুষ জাতি ? তা হলে আর এখন এই সব পরীক্ষা করে লাভ কী ?

—দু' দশক আগে যখন নিউট্রন বোমা আবিষ্কার হয়, তখন তার বৈশিষ্ট্য ছিল, বাড়ি ঘর বা সম্পত্তি কিছু নষ্ট হবে না, শুধু মানুষ মরবে। অর্থাৎ তখনো এক জাতি হারবে অন্য জাতি জিতবে এ রকম আশা ছিল বোধহয়। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রটো-নিউট্রন অস্ত্রের কৃতিত্ব এই যে প্রথমে ইন-অর্গানিক জিনিসগুলো, অর্থাৎ বাড়ি ঘর তো বটেই, অনেক পাহাড় পর্বতও ধ্বংস হবে, তারপর মরবে প্রাণীরা। তাদের শরীর গলে গলে পড়বে। অর্থাৎ মানুষ আগে নিজের চোখে পৃথিবীর ধ্বংস প্রত্যক্ষ করে তারপর চোখ বুজবে। এখন এই অবস্থায়, এদিকে সেদিকে দু'চার জন মানুষের বেঁচে যাওয়া হয়তো কোনোক্রমে সম্ভব। যদিও সম্ভাবনা খুবই কম, তা হলেও কোনো অলৌকিক উপায়ে এরকম হতেও পারে। যদি সে রকম হয়, তখন সেই সব মানুষ কিন্তু সভ্যতার কোনো সরঞ্জামই পাবে না, তাদের বাঁচতে হবে একেবারে আদিম মানুষেরই মতন। সেই অবস্থাটাই আমরা এখানে পরীক্ষা করে দেখছি।

—এরকম দেখায় কি লাভ ?

—হয়তো কোনোই লাভ নেই। কিংবা এই টুকুই লাভ বলতে পারেন, মৃত্যুর আগে আমরা এই সান্ত্বনা নিয়ে যেতে পারবো যে আমরা শেষ হয়ে গেলেও কয়েকজন মানুষ অন্তত বাঁচার দিকে এগিয়ে যাবে। তারাই গড়ে তুলবে নতুন পৃথিবী। নতুন মানব-সমাজ।

তৃতীয় এবার বললেন, 'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়।' এখন দেখুন, লোকটি জেগে উঠেছে।

এবারে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে ওরা দ্বীপের দৃশ্য দেখলো। জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তরুণের ছুটে যাওয়া, তার কান্না, তার তৃষ্ণা মেটাবার ও আগুন জ্বালাবার চেষ্টা, তার খাদ্য অন্বেষণ এবং প্রথমবার বনের প্রান্ত থেকে ফিরে আসার চেষ্টা পর্যন্ত।

প্রথম বললেন, এবার একটু থামাও। মহাশয়া, আমরা সাবজেক্ট নাম্বার ওয়ান-এর প্রথম দিনের কৃতিত্ব দেখে অভিভূত হয়ে গেছি। কোনো রকম সম্বল ছাড়াই সে বাঁচার লড়াইতে অনেকটা এগিয়ে গেছে।

তৃতীয় বললেন, একটা খুব অত্যাশ্চর্য মিল এই যে, খাঁচার মধ্যে একটা সাদা ইঁদুরকে ভরে দিলে সে প্রথমেই ছুটোছুটি শুরু করে। চার দিকের দেওয়ালে ধাক্কা খায়। অর্থাৎ সে তার টেরিটরি বুঝে নিতে চায়। এই মানুষটিকেও দেখলেন, ঠিক সেই রকম ছোটাছুটি করতে লাগলো। অর্থাৎ নিঃসঙ্গ মানুষও অচেনা জায়গায় টেরিটরি বুঝে নেয় আগে।

মহাশয়া তীব্র স্বরে বললেন, দয়া করে ইঁদুরের সঙ্গে মানুষের তুলনা দেবেন না। আমার শুনতে ভালো লাগে না।

তৃতীয় বললেন, আমরা বৈজ্ঞানিকরা অবশ্য এই ভাবেই সাধারণ লক্ষণগুলি বিবেচনা করি।

—সেই জন্যই তো আমাকে এখানে পাঠানো হয়েছে। মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখুন।

প্রথম একটু হেসে বললেন, মানুষ আর ইঁদুর যে আলাদা তার প্রমাণ ঐ মানুষটি অচেনা জঙ্গলে ঢুকলো না। যাই হোক, সীমানা বুঝে নেওয়ার চেয়েও আশ্চর্য হলো, এত তাড়াতাড়ি ওর পাথরের কুঠার এবং আগুনের ব্যবহার। শুধু ঐ রকম কুঠারের ব্যবহার শিখতেই মানুষের কয়েক লক্ষ বছর লেগেছিল। আর আগুন তো এই সেদিনের কথা। মহাশয়া, আপনাকে বোধহয় জানানো হয় নি যে এই মানুষটির কোনো স্মৃতি নেই।

—তার মানে ?

—ওখানে যাদের পাঠানো হবে তাদের সবাইকার স্মৃতিই মুছে দেওয়া হয়েছে।

—কেন, এ রকম করবার কারণ ?

—কারণ অনেকগুলো। প্রথমেই ধরুন, স্মৃতি মানেই দুঃখ। সমস্ত স্মৃতি নিয়ে যদি ওরা ওখানে নির্বাসনে যেত, তাহলে বেশীর ভাগ সময়ই নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে বসে পুরোনো কথা ভাবতো। আগের জীবনের সঙ্গে এই জীবনের তুলনা করতো। যদি ওদের মনে থাকতো যে আমরাই ওদের ওখানে পাঠিয়েছি, তা হলে আমাদের ওপর রাগ বা অভিমান হতো অনবরত। কিংবা ওরা আশা করতো যে পরীক্ষা শেষ হলেই ওরা ফিরে যাবে। সুতরাং এখানকার এই দ্বীপের জীবনের কিছুদিন কোনোক্রমে কাটিয়ে দিলেই হলো। সে হতো অনেকটা পিকনিকের মতন। তা ছাড়া, প্রোটো-নিউট্রন বিস্ফোরণে যে উত্তাল তরঙ্গ হবে বায়ুস্তরে, তা সহ্য করে যদি দু' চারজন বেঁচেও থাকে, তবুও সাধারণ সুস্থ মানুষ থাকা তাদের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। শেল-শকেই অনেকের স্মৃতি চলে যায় সাময়িক ভাবে। ওদের তো স্মৃতি থাকবেই না, বরং পাগল হয়ে যাওয়ারই বেশী সম্ভাবনা।

তৃতীয় বললেন, স্মৃতি মানে ব্যক্তিত্বও বটে। একজন মানুষের জীবন গড়ে ওঠে তার স্মৃতি নিয়ে। একজন আধুনিক কালের স্মৃতি সম্পন্ন মানুষের পক্ষে আদিম মানুষের জীবনযাত্রা গ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব। তার বদলে সে হঠাৎ আত্মহত্যা করে ফেলতে পারে। আত্মহত্যাও আধুনিক ব্যাধি।

মহাশয়া বিস্মিত ভাবে বললেন, কিন্তু আপনারা ইচ্ছে করলেই মানুষের স্মৃতি মুছে দিতে পারেন ? কী করে তা সম্ভব ?

তৃতীয় বললেন, স্মৃতি দু'রকম। নিকট অতীতের আর স্থায়ী। আপনি মানুষের মগজের গড়ন সম্পর্কে অবহিত আছেন কি ? না হলে...

—আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আমি জড়বুদ্ধিদের জন্য একটি বিরাট প্রতিষ্ঠান চালাই। মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়ার চর্চা করেই আমার বেশী সময় কাটে। আমি এও জানি যে মানুষের মগজ এক হাজার বিলিয়ান ইউনিট স্মৃতি ধরে রাখতে সক্ষম। এই বিপুল স্মৃতি ভাণ্ডার ইচ্ছে করে মোছা যায় ?

—আপনি অনেক কিছুই জানেন দেখছি। তা হলে রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড...

—আর এন এ ? যা দিয়ে প্রোটিন সিনথেসিস হয়।

—বাঃ ! ঠিক ধরেছেন। সেই আর এন এ-র প্রোটিন সিনথেসিস বন্ধ করে দেওয়া যায় পিউরোমাইসিন ইঞ্জেকশান দিয়ে। তাতেই লুপ্ত হয়ে যায় স্মৃতি।

—কিন্তু স্মৃতি যদি না থাকে তা হলে ওরা কী করে পাথরের অস্ত্র বানালো ? আগুন চিনলো ? আদিম মানুষের তো এসব জ্ঞান ছিল না।

—ঐ যে বললুম, স্মৃতি দু' রকম। একটা হলো রেস মেমরি। সেটা মোছা যায় না। বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যা শিখেছে সেটা তার অনুভূতিতে গেঁথে গেছে। একটা ওরাং উটাং-এর বাচ্চা হাতের মুঠোয় লাঠি ধরে গাছ থেকে ফল পাড়তে পারে না। কিন্তু একটা চার-পাঁচ বছরের মানুষ-শিশু এমনি এমনিই লাঠি ধরতে শিখে যায়। এমনকি কোনো বদ্ধ পাগল মানুষও লাঠি ধরতে ভুলে যায় না। এরই নাম রেস মেমরি, এই স্মৃতি চিরস্থায়ী। আপনাকে একটা খুব সামান্য উদাহরণ দিলাম।

প্রথম বললেন, আচ্ছা, এর পর আবার দেখা যাক।

আরও কিছু কিছু নির্বাচিত দৃশ্য দেখবার পর খোকা এসে পড়তেই মহাশয়া খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। বললেন, বাঃ, কী সুন্দর ছেলেটি। ওকেও আপনারা এই কষ্টের মধ্যে পাঠালেন ?

তৃতীয় বললেন, ছেলেটি সুন্দর বটে, কিন্তু খুব দুষ্টুও আছে। দেখবেন একটু পরে।

প্রথম বললেন, আপনারও দুটি ছেলে-মেয়ে আছে না ?

মহাশয়া বললেন, আমার সন্তান সংখ্যা এক হাজার ছিয়াত্তর। আমি সবাইকেই সমানভাবে দেখি।

প্রথম বললেন, আমার একটি ছেলে আছে, ঠিক এই বয়েসী। আমাদের সন্তানদের জন্য আমরা সব সময়ই একটা সুখী ভবিষ্যৎ রেখে যেতে চাই। কিন্তু আসলে ওদের কোনো ভবিষ্যৎই নেই। আমরা তবু এই জীবনের পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশটা বছর অন্তত দেখে গেলাম। ওরা তাও দেখলো না—

মহাশয়া বললেন, আমি এখনো ঠিক মানতে পারছি না যে—

কথায় বাধা পড়লো এই সময় দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন কবি। চোখ প্রায় বুজে এসেছে, কণ্ঠস্বর ভারী।

তিনি বললেন, আমাদের ঘরে পাত্রপাত্রীরা সবাই এখন ঘুমিয়ে পড়েছে। সুতরাং আমাদেরও এখন ঘুমোবার সময়। এর মধ্যে একটা খুব মজার ব্যাপার ঘটেছিল, জানো—

মহাশয়া ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, থাক, বলবেন না। আমি সব কিছু নিজের চোখে দেখতে চাই।

—বেশ ভালো কথা। তোমরাও কি এখন বন্ধ রেখে ঘুমোতে যাবে, না হোল নাইট শো দেখবে ?

—আমার আরও দেখতে ইচ্ছে করছে। অবশ্য যদি এঁদের আপত্তি না থাকে।

—আরে এই বৈজ্ঞানিক ছেলেমেয়েগুলো দৈত্যের মতন খাটতে পারে। দেখছি তো ক'দিন ধরে। পালা করে একজন তো রাত জাগবেই। তবে, বুঝলে মহাশয়া, রাত্তিরে বিশেষ কিছু নেই, প্রিমিটিভ জীবনের ঐ এক ব্যাপার—অন্ধকার হলেই সব ক্রিয়াকলাপ বন্ধ, অবশ্য যতদিন না—

—আপনি শুয়ে পড়ুন, আমরা আর একটু দেখি।

কবি হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বড় বড় চোখ মেলে তিনজনকে দেখলেন ভালো করে। কী যেন চিন্তা করলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর দরজার কাছ থেকে সরে গিয়েও শুতে গেলেন না। বাইরের দিকের জানলার কাছে নিজের নাকটা চেপে ধরে মহাশূন্যের নীল অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে গাইতে লাগলেন কী একটা গান।

পাশের ঘর থেকে দ্বিতীয়া এসে বললেন, তোমরা কেউ একজন অবজারভেশনে যাও, আমি একটু এখানে বসি।

প্রথম বললেন, আমি যাচ্ছি।

আরও খানিকটা দেখবার পর মহাশয়া জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটির সঙ্গে মাউথ অর্গান দিলেন কেন ? সব ধ্বংস হয়ে গেলেও মাউথ অর্গান টিকে থাকবে ?

তৃতীয় বললেন, যখন সব মানুষেরই ধ্বংস হয়ে যাবার কথা, তার মধ্যে এরকম দু'চারজন যদি বেঁচে যায়, তা হলে আরও দু'চারটি এরকম টুকিটাকি জিনিসও টিকে যাওয়া সম্ভব। মাঝে মাঝে একটু আধটু মিউজিক থাকলে আমাদেরও ভালো লাগবে। দেখবেন, ঐ পুরুষটি বেশ ভালো বাজায়।

—তার মানে ? ওর স্মৃতি নেই বলছেন, অথচ ও মাউথ অর্গান বাজানো মনে রেখেছে কী করে ?

—মহাশয়া, স্মৃতির ব্যাপারটা বড়ই জটিল। এর সম্পূর্ণ মর্ম উদ্ধার করা এখনো আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। এমনকি, আর এন এ-র প্রোটিন সিনথেসিস বন্ধ করে দেবার পরও দেখা গেল, খুব জ্বরের সময় ঐ বাচ্চা ছেলেটি দু' একটা স্মৃতি ফিরে পাচ্ছিল। এটা কী করে হলো আমরাও বুঝতে পারছি না।

—তা হলে আর একটা প্রশ্নের জবাব দিন। এদের প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশে নিয়ে গেছেন, কিন্তু এই দ্বীপটা কোথায় ? যে-কোনো সময় তো এর পাশ দিয়ে জাহাজ যেতে পারে কিংবা প্লেন যেতে পারে।

—সে ব্যবস্থা করা আছে। সমস্ত জাহাজের লাইন ও বিমান কোম্পানিকে জানিয়ে দেওয়া আছে যে এখানে থার্মো নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণ হবে, তার রেডিয়েশান হতে পারে এক শো মাইল বৃত্ত জুড়ে। এদিকে এমনিতেও কেউ আসে না, এর পর ভয়েই কেউ আসবে না। তবু, দ্বীপটির দু' দিকে কুড়ি নট্ দূরে দুটি সাবমেরিন রাখা আছে, যাতে কোনো জেলে ডিঙ্গিও হঠাৎ ওদিকে না ভেসে যেতে পারে।

—দ্বীপটা কোথায় বললেন না তো ?

—ভারত মহাসাগরে। এরকম কুমারী দ্বীপ ঐ দিকেই মাত্র কয়েকটা আছে।

—পৃথিবীর কোনো দেশ এরকম একটা দ্বীপ দখল না করে এমনি ফেলে রেখেছিল ? পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন দেড় হাজার কোটি, তবুও ?

—পৃথিবীর মানুষ সব জায়গায় সমান ভাবে ছড়িয়ে থাকলে এখনো স্থানাভাব হবার কথা নয়। আপনি কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশ কিংবা দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি বর্গমাইল জনবসতির তুলনা করুন। যাই হোক, এ দ্বীপে আগে মানুষ থাকতে আসেনি কারণ এখানে পানীয় জল নেই। রাজনৈতিক ভাবে এটি নিউজিল্যাণ্ডের দখলে ছিল, রাষ্ট্রপুঞ্জ সেটা কিনে নিয়েছে।

—ছোট ছেলেটির সঙ্গে লোকটির কত তাড়াতাড়ি ভাব হয়ে গেল ! ছোটরা ম্যাজিক জানে। ওরা মানুষের মন থেকে হিংসে, রাগ এসব ভুলিয়ে দিতে পারে।

দ্বিতীয়া এবং তৃতীয় পরস্পর চোখাচোখি করে একসঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

দ্বিতীয়া বললেন, মাঝে মাঝে কবি এক একটা মন্তব্য করেন ভারি মজার। প্রথম যেদিন দু'টি কচ্ছপ ধরা পড়লো, একটা পালিয়ে গেল, সেই জায়গাটা দেখে উনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, ঐ পলাতক কচ্ছপটি আজ কি স্বপ্ন দেখবে বলো তো ! কচ্ছপরা সব সময় লাল রঙের স্বপ্ন দেখে, তা জানো নিশ্চয়ই !

মহাশয়া অন্যদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে যোগ দিলেন না। কারণ ছোট ছেলেটির জ্বরের দৃশ্য তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ভাবে দেখছেন। সোজা হয়ে বসলেন, তিনি মনে মনে ভাবলেন, বৈজ্ঞানিকরা সত্যিই হৃদয়হীন হয়, একটি শিশুর অসুখের কষ্টের সময়ও। তিনি ভুলে গেলেন যে এই সব দৃশ্য ওঁরা আগেই দেখেছেন।

মহাশয়ার প্রতিক্রিয়া দেখেই তৃতীয় তাড়াতাড়ি খোকার আরোগ্যের দৃশ্য দেখিয়ে দিলেন। এবার মহাশয়া আরাম করে বসলেন, তাঁর মুখে হাসি ফুটলো, তিনি মনে মনে হিসেব করে তার চতুর্থ সিগারেটটি ধরালেন।

তারপরই আবার সোজা হয়ে বসে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, এ কি এর মধ্যে একটি মেয়েকে নিয়ে এলেন কেন ?

পর্দায় তখন সকালের আলোয় বালির ওপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকা একটি যুবতী। তরুণ তখনও আসেনি, খোকা ঝুঁকে আছে মেয়েটির মুখের কাছে।

তৃতীয় এবার হেসে ফেলে বললেন, আপনি আশ্চর্য কথা বললেন, মহাশয়া। এমনকি কোনো চলচ্চিত্রে যদি নায়িকা না থাকে, তা হলে সবচেয়ে বেশী আপত্তি জানায় মেয়েরাই। সেই নায়িকা যথেষ্ট রূপসী কি না সে সম্পর্কেও মেয়েরাই বেশী আলোচনা করে। যে চলচ্চিত্রের নায়িকা যথেষ্ট সুন্দরী নয়, দেখা গেছে, সে চলচ্চিত্রে মহিলা দর্শকরাই খুব কম যান।

এ ধরনের লঘু কথা যাতে তাঁর সামনে আর কখনো উচ্চারণ না করা হয় এইরকম একটা ভঙ্গি নিয়ে গম্ভীরভাবে মহাশয়া বললেন, চলচ্চিত্র তৈরি হয় প্রমোদের জন্য। আপনারা পরীক্ষা করছেন মানুষের জীবন নিয়ে। মানুষের জীবন সব সময় প্রমোদের উপকরণে পূর্ণ থাকে না। বিশেষত যে-ধরনের কঠোর জীবন সংগ্রামে এরা ব্যস্ত।

দ্বিতীয়া এবার বললেন, প্রথমে ঠিক ছিল, একটি পুরুষ ও একটি নারীকে এক সঙ্গে পাঠানো হবে। বিবর্তনের যে-কোনো পদক্ষেপ তো সেইভাবেই শুরু হবার কথা। মনে করুন আদম্ ও ইভের কাহিনী। কিন্তু তারপরে আবার চিন্তা করা হলো যে তাতে কালচারাল ফ্যাকটরের জন্য কিছুটা সময় নষ্ট হবে।

—অর্থাৎ ?

—বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এই সংস্কৃতি নামে আলাদা একটা জিনিসও তৈরি করেছে, যা অন্য কোনো প্রাণীর নেই। এতে মানুষের সঙ্গে মানুষের খানিকটা দূরত্বেরও সৃষ্টি হয়েছে। ধরুন, একটা সিংহর সঙ্গে একটা সিংহিনীর যে পদ্ধতিতে যৌন মিলন হয়, একলক্ষ বছর আগেও ঠিক সেইভাবেই হতো। কিন্তু এই ব্যাপারে আদিম মানুষের সঙ্গে আধুনিক মানুষের অনেক অনেক তফাৎ—

—কী করে জানলেন যে সিংহরা একলক্ষ বছর আগেও···

—এটা জানবার জন্য কোনো তদন্তেরও দরকার হয় না। কারণ, সিংহ বা অন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের যৌন ক্রিয়াকলাপ এখনো এমনই আদিম স্তরে আছে যে যার নিচে গেলে আর বংশ রক্ষাই হয় না। এখনো তারা নিছক প্রকৃতির নির্দেশে বছরের নির্দিষ্ট একটা সময়ে শুধু বংশ বৃদ্ধির জন্যই যৌন-ব্যথা বোধ করে, সিংহ ও সিংহিনী পরস্পরের প্রতি মিলন ডাক দেয়, মিলন হয়, তারপর সিংহিনীটি গর্ভবতী হলেই কাজ ফুরিয়ে যায়। এর মধ্যে শারীরিক বা মানসিক সুখের কোনো স্থান নেই। বছরের বাকি সময়টা তাদের মনে কোনো রকম যৌন চিন্তা আসেই না। অপরপক্ষে মানুষ তার কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত, তার আগে-পরের জটিল অবস্থার কথা বাদই দিচ্ছি, সর্বক্ষণই যৌন আকাঙ্ক্ষা বহন করে বেড়ায়। মানুষের ঝোঁক পেয়ার বণ্ডের দিকে, অর্থাৎ যুগল বন্ধন, অর্থাৎ পরস্পরের মনোনীত নারী ও পুরুষ সারা জীবন, অন্তত বেশ কিছুদিন একসঙ্গে থাকতে চায়। তাদের প্রাক্-মিলন আচরণও দীর্ঘায়িত হয়। কানে কানে ফিসফিস করে কথা, আঙুলে অঙুল ছুঁয়ে বিদ্যুৎ তরঙ্গ। একটা দুটো চুমু, কানের লতিতে একটু আদর, এই সব আর কি ! তাদের যৌন মিলন প্রধানত সুখের জন্য, শুধু বংশ বৃদ্ধির জন্যই নয়, কারণ গর্ভবতী নারীও তার পুরুষের সঙ্গে সহবাস কামনা করে। এই সুখ জিনিসটাই সংস্কৃতির দান। অথবা যৌন মিলনে সুখ পেয়েছে বলেই মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। নইলে আপনি জানেন বোধহয়, মানুষের যা মগজের পরিমাণ, ডলফিনেরও তাই।

দ্বিতীয়ার এই দীর্ঘ বর্ণনার সময় মহাশয়া বিস্ফারিত চোখে এই মেয়েটিকে দেখছিলেন। দ্বিতীয়ার মুখখানা অনেকটা ল্যাপাপোঁছা ধরনের, তাঁর নাক, চোখ ও থুতনি কোনোটাই খুব তীক্ষ্ণ গড়নের নয়, বরং তাঁর কপালটা চওড়া। সব মিলিয়ে তাঁর মুখে বেশ একটা সারল্যের ভাব ফুটে আছে। তিনি কথাও বলেন হাসি মিশিয়ে।

মহাশয়া আরও কিছু প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই তৃতীয় একটি ছোট্ট কাশি দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, দ্বিতীয়া, আমরা বোধহয় আমাদের বিষয় থেকে

অনেকটা দূরে সরে যাচ্ছি । আমরা প্রথমেই দু'জন নারী পুরুষকে একসঙ্গে পাঠাইনি । তার কারণ, এরকম নির্জনে একটি নারী ও পুরুষ থাকলে, তারা যদি সাধারণ, সভ্য, সাংস্কৃতিক মানুষ হয়, তাহলে তারা পরস্পরের মনে প্রভাব বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে, অন্য কিছুর প্রতি আর খেয়ালই থাকে না । তাতে অনেকটা সময় চলে যাবে বলেই আমরা পুরুষটির পর বালকটিকে পাঠিয়েছি । ইনোভেশন বা আবিষ্কারের প্রবৃত্তি পুরুষদেরই বেশী থাকে । ওরা এর মধ্যেই পরিবেশটা মোটামুটি জেনে নিয়েছে । এরপর মেয়েটি এলেও মাঝখানে বালকটি থাকায় ওদের সম্পর্ক অনেক সহজ হবে ।

—আবিষ্কারের প্রবৃত্তি পুরুষদেরই বেশী, একথা কে বললে আপনাকে ?

—মহাশয়া, আমি পুরুষ প্রাধান্যের সমর্থক নই, এটা বায়োলজিক্যাল সত্য !

—মেয়েটির কাছে একটা ছুরি কেন ?

—পুরুষটি প্রথমেই কী রকম আচরণ করবে, সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত ছিলাম না । ওর স্মৃতি নেই, সুতরাং কালচারাল ফ্যাক্টর ওর মধ্যে কতখানি কাজ করবে, তাও আমরা ঠিক জানি না । প্রথমেই যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে ? মেয়েরা অচেনা পুরুষ মাত্রকেই প্রথমে একটু ভয় পায়, বিশেষত মিলন-পূর্ব ছোটখাটো আদরের আচরণের আগেই যদি...তা হলে ওরা শক্ পেতে পারে । মেয়েদের দমন করবার জন্য পুরুষের কোনো অস্ত্র লাগে না, তারা মনে করে তাদের যৌন দণ্ডটিই অস্ত্র । এই পুরুষটি যদি হঠাৎ প্রথমেই বর্বরের মতন ব্যবহার করে, সেই জন্যই আমরা মেয়েটির কাছে একটি আত্মরক্ষার অস্ত্র দিয়েছি ।

—পুরুষটিকে তো খুবই ভদ্র দেখা যাচ্ছে ।

—সেটাও খুব আশ্চর্যের ।

—আচ্ছা, এরা কারা ? এরা কি স্বেচ্ছায় এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে রাজী হয়েছে ? এরা কি পরস্পরের চেনা না অচেনা ? স্মৃতি লোপ পাবার আগে কি মেয়েটি জানতো যে একটা দ্বীপে গিয়ে তাকে একজন পুরুষের সঙ্গে থাকতে হবে ?

—এরা সকলেই অচেনা, শুধু এইটুকুই বলতে পারি । এদের পূর্ব-পরিচয় এখন আপনাদের জানানো হবে না, তাতে আপনাদের মন প্রভাবিত হয়ে যেতে পারে ।

দ্বিতীয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, এবারে আমি ঘুমোতে চললুম ।

তৃতীয় বললেন, এঁকে আমি ঐ মেয়েটির রাগ করে সমুদ্রের জলে বসে-পড়া পর্যন্ত দেখিয়ে দিই, তারপর বন্ধ করে দেবো ।

এই সময় কবি আবার দরজার কাছে ফিরে এসে দাঁড়ালেন । পর্দার দিকে আঙুল তুলে বললেন, ঐ ছোকরাটি ঐ মেয়েটিকে প্রথম যে বাক্যটি বললো, তা তোমার চেনা চেনা লাগলো না, মহাশয়া ?

মহাশয়া বললেন, না তো !

কবি বললেন, ঐ ছুরি ব্যাপারটা, শেকসপীয়ারের ওথেলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয় । তোমরা কিছুই পড়াশুনো করো না আজকাল !

॥ ৬ ॥

জঙ্গলের ধার দিয়ে হাঁটা খুব সহজ নয়, এখানে বালি নেই, এবড়ো খেবড়ো পাথর । কোথাও কোথাও সমুদ্রের ফেনা জমে জমে কাদার মতন হয়ে আছে ।

খোকা তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে অনেকখানি । তরুণ তাকে বার বার ডেকে ডেকে ফিরিয়ে আনছে । সে অনবরত নজর রাখছে জঙ্গলের দিকে । কুকুরের পাল হঠাৎ বেরিয়ে এলে মুশকিল হবে । আগের দিন আট-দশটা এসেছিল, এক সঙ্গে যদি পঁচিশ তিরিশটা এসে পড়ে, তখন কি লড়াইতে ওদের সঙ্গে পারা যাবে ? মেয়েটিকে নিয়েই বেশী মুশকিলে পড়তে হবে ।

তরুণ এই যাত্রাপথে মেয়েটির সঙ্গে একটিও কথা বলেনি । মেয়েটিও কথা বলছে শুধু খোকার সঙ্গেই । খোকা কিন্তু এখন নিজের সঙ্গে কথা বলতেই বেশী উৎসাহী । হাতে তার তীর-ধনুক, অভিযাত্রীর মতন তার চোখ মুখ নতুন কিছুর সম্ভাবনায় উজ্জ্বল । সে মাঝে মাঝেই যুবতীর হাত ছাড়িয়ে চলে যাচ্ছে জঙ্গলের দিকে । কিংবা কোনো নতুন আকারের ঝিনুক কিংবা পাথর দেখতে পেলে লাফিয়ে লাফিয়ে কুড়িয়ে এনে কী যেন বলছে তাদের ।

বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর যুবতী জিজ্ঞেস করলো, এই খোকা, আমরা আর কত দূরে যাবো রে ?

খোকা বললো, ঐ ওকে জিজ্ঞেস করো না !

যুবতী তা জিজ্ঞেস করলো না, বরং নিজেই বললো, তোরা তাহলে যা, আমি এখানেই বসছি । আমার আর হাঁটতে ভালো লাগছে না ।

খোকা বিজ্ঞের মতন বললো, তুমি এখানে একা বসে থাকতে পারবে না । তোমায় কুকুরে কামড়াবে ।

—কুকুর ?

তরুণ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, খোকা, তুই-ও এখানে বোস, তোকে আর আসতে হবে না । আমি আর একটুখানি দেখে আসছি । বেশী দূরে যাবো না—

—না, আমি তোমার সঙ্গে যা-বো-ও-ও !

—উঁহু ! তোরা এই উঁচু পাথরটার ওপরে উঠে বসে থাক । এটা বেশ উঁচু আছে । যদি কুকুরের পাল আসে, আমায় ডাকবি, কিংবা জোরে জোরে মাউথ অর্গানটা বাজাবি !

তরুণ আবার এগোতে লাগলো সামনের দিকে ।

যুবতী এবং খোকা অনেকটা লাউয়ের মতন দেখতে পাথরটার চূড়ায় উঠে এলো । সমুদ্রের দিকে পেছন ফিরে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে গা ছড়িয়ে দিল সামনের দিকে । এখান থেকে জঙ্গলটি বেশ মনোহর দেখায়, কোনো হিংস্রতার নামগন্ধ নেই । সম্ভবত এদিকটায় মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল উঠে এসে জঙ্গলের ভেতর পর্যন্ত চলে যায় । কেন

না, এদিককার গাছগুলিও বেশ গাট্টাগোট্টা ও জেদী ধরনের।
যুবতী জিজ্ঞেস করলো, এই জঙ্গলে কুকুর আছে? কত বড় কুকুর?
—বাঃ তোমাকে যে তখন আমরা বললুম জঙ্গলে কুকুর আছে। তুমি তবু বললে বেশ করবো জঙ্গলে যাবো!
—আমি ভেবেছিলুম, তোরা মিথ্যে মিথ্যে আমাকে ভয় দেখাচ্ছিলি।
—অনেক কুকুর আছে, ছোট কুকুর, বড় কুকুর। এক একটা কুকুর এই অ্যাত্ত বড়, আমার চেয়ে বড়, জ্বলজ্বলে চোখ, একবার কামড়ালেই তোমার মুণ্ডুটা খেয়ে ফেলতে পারে!
—ভ্যাট!
—আমি বাজে কথা বলছি? ওকে জিজ্ঞেস করো। তবে ওর খুব গায়ের জোর। ও থাকলে কোনো কুকুর সামনে আসতে সাহস করবে না।
—ওর নাম কী রে?
—কী জানি!
—তুই আমার নাম দিয়েছিস, আর ওর নাম দিসনি?
—তুমি দাও না ওর একটা নাম!
যুবতী হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে পিছন ফিরে সমুদ্রের দিকে তাকালো। যেন সে সমুদ্রের পরপার দেখতে চায়। সমুদ্র এখন শান্ত, বাতাসের সঙ্গে খুব ভাব।
—আমার এখানে একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না রে, খোকা। মনে হচ্ছে এক্ষুনি চলে যাই!
—কোথায়?
—তা তো জানি না!
—এই আকাশ, তুমি আবার কাঁদছো?
যুবতী দুই বাহু জোড়া দিয়ে তার চোখ ঢেকেছে। খোকা তার চুলে হাত বুলোতে লাগলো। হাতখানি বালকের, কিন্তু ভঙ্গিটা অনেকটা প্রেমিকের মতন।
—দেখো তো, আমি আর কাঁদি না। ও-তো একদমই কাঁদে না। আমি প্রথমে একটু কেঁদেছিলুম, সে আমার অসুখ করেছিল বলে। কিন্তু এখন আর কাঁদি না।
যুবতীর শরীরটা কাঁপতে লাগলো, সে কোনো কথা বললো না।
খোকার পক্ষে আর কোনো সান্ত্বনার ভাষা তৈরি করা বেশ শক্ত। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে তার নিজস্ব বুদ্ধিতে এই কান্নার কারণ খুঁজে বার করে ফেললো।
—বুঝেছি, তোমার খুব খিদে পেয়েছে, তাই না? তুমি কিছু খাওনি!
যুবতী এবারেও কোনো উত্তর না দেওয়ায় খোকা তাকে বারবার ঠেলা দিয়ে বলতে লাগলো, আকাশ, সত্যি করে বলো, তোমার খিদে পায় নি? এই, বলো না! হ্যাঁ খিদে পেয়েছে, আমি জানি, ঠিক খিদে পেয়েছে—দাঁড়াও, এখানকার গাছে ফল আছে কি না আমি দেখে আসছি।

যুবতী এবার খোকার হাত চেপে ধরে বললো, না, তোকে একলা একলা জঙ্গলে যেতে হবে না।
—বেশী ভেতরে যাবো না, কাছেই খুঁজে দেখবো।
—না, বলছি যেতে হবে না!
এদিকে তরুণ খুব সতর্ক ভাবে এগুতে লাগলো সামনের দিকে। মাঝে মাঝে সে পেছন ফিরে ওদের দেখে নিচ্ছে। বেশী দূর সে যেতে পারলো না, একটা নদীর সামনে এসে তাকে থমকে যেতে হলো।
ঠিক নদী নয়, খাঁড়ি, সমুদ্রের জল এখানে অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেছে। খাঁড়ির ওপাশেও জঙ্গল আর ছোট ছোট পাহাড়, তবে ক্রমশ ঐদিকে যে দ্বীপের সীমানা শেষ হয়ে গেছে তাও বোঝা যায়।
এখন ভাটার সময়, খাঁড়ির জল তেমন গভীর নয়, পার হওয়া কষ্টকর নয় তেমন। তবু তরুণ আজ এই পর্যন্তই থামতে চাইলো। একদিন তাকে পুরো দ্বীপটা ঘুরে দেখে আসতেই হবে।
এই জায়গাটা বড় সুন্দর। একই সমুদ্র, পাহাড় ও জঙ্গলের সন্নিধান চোখকে আরাম দেয়। সমুদ্রের প্রতি ততটা নয়, কিন্তু নদীর প্রতি মানুষের একটা রক্তের টান আছে। তরুণ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো, তারা যেখানে আছে তার বদলে এই নদীর ধারটা বাড়ি বানাবার পক্ষে অনেক বেশী উপযুক্ত। কাছাকাছি অনেকগুলো পাথরের চাঁই পড়ে আছে। সেগুলোর মাঝখানে বাড়ি তৈরি করলে ঝড়ের সময় অনেকটা নিরাপদ থাকা যেতে পারে। তবে জঙ্গল বড় কাছে। কুকুরের পালকে আটকাবার একটা ব্যবস্থা আগে করা দরকার।
খাঁড়ির টলটলে জলে বড় বড় মাছের ছায়া দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জলের মাছ কী করে ধরতে হয় তা তরুণ জানে না, কিন্তু ঐ মাছ যে তার খাদ্য তা সে জানে। ধরার একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবেই।
তরুণ একবার পেছন ফিরে দেখবার চেষ্টা করলো খোকা আর যুবতীকে দেখা যায় কি না। দেখা গেল না। দ্বীপটা নিশ্চয়ই এখানে বাঁক নিয়েছে তাই ওরা আড়ালে পড়ে গেছে।
তরুণ মনে মনে এখানে ঘর বানাবার মতন একটা জায়গাও ঠিক করে ফেললো। তারপরই তার চোখ পড়লো একটু দূরে একেবারে জলের কিনারায় দুটি সিন্ধু সারস ডানার জল ঝাড়তে ঝাড়তে পরম নিশ্চিন্তে প্রসাধনে ব্যস্ত। তরুণ মুগ্ধভাবে তাকিয়ে রইলো সেদিকে। এমন চমৎকার সুযোগ সে আর কখনো পায়নি।
দুটো টুকরো পাথর বেছে নিয়ে সে বড় বড় পাথরের চাঁইয়ের আড়ালে আড়ালে এগোতে লাগলো পা টিপে টিপে। শরীরটাকে ওজন-শূন্য করে ফেলেছে, তার সমস্ত পেশী সজাগ।
অনেকটা কাছাকাছি এসে সে নিশ্চিন্ত হাঁসদুটিকে মারবার জন্য হাত উদ্যত করেছে,

তখনই সে শুনতে পেল খোকার প্রবল আর্তনাদ, এই, এই, শিগগির এসো ! তারপরই মাউথ অর্গানের আওয়াজ !

মুহূর্তের জন্য দিশাহারা হয়ে গেল তরুণ। আগে সে হাঁস মেরে তারপর যাবে ওদের উদ্ধারের জন্য। যদি দেরি হয়ে যায় ? এখনকার মতন শিকার হাতছাড়া করে, ওদের কাছেই এক্ষুনি যাওয়া উচিত ? কিন্তু এত হাতের কাছের নির্ঘাত, অব্যর্থ শিকার। এইরকম দ্বিধার জন্য সে দুর্বল হয়ে গেল। ফলে, সে অতি দ্রুত পাথর ছুঁড়লেও নিশানা ঠিক হলো না, হাঁস দুটিও এরই মধ্যে বিপদ টের পেয়ে কঁক্ কঁক্ শব্দ করে উঠলো, চোখের নিমেষে ডানা ঝাপ্‌টে বাতাসে ভাসলো।

প্রচণ্ড বেগে দৌড়ে এসে তরুণ দেখল কুকুরের পালের চিহ্ন নেই। অন্য কোনো বিপদও ঘটে নি। মেয়েটি খোকার হাত চেপে ধরে আছে, আর খোকা তারস্বরে চেঁচাচ্ছে। তরুণকে দেখতে পেয়েই খোকা খিলখিল করে হাসতে লাগলো।

তরুণ কিন্তু খোকাকে বকলো না কিংবা রাগ দেখালো না। লাউ-এর আকারের পাথরটির নিচে দাঁড়িয়ে সে প্রথমে কিছুটা দম নিয়ে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে, খোকা ?

—এই দ্যাখো না, এত বড় মেয়ে খিদে পেয়ে কাঁদছে !

যুবতী এই সময় খুকী হয়ে গিয়ে সেইরকম গলায় বললো, খোকা ! তুই কি মিথ্যুক রে !

—বাঃ, তুমি খিদে পেয়ে কাঁদো নি ? ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কাঁদছিলে !

—এক চড় লাগাবো এবার তোকে।

তারপর তরুণের দিকে চেয়ে বললো, ও একলা একলা জঙ্গলে যেতে চাইছিল, আমি ওকে যেতে দিইনি।

তরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কী সুন্দর একটা শিকার আজ ফস্‌কে গেল ওদের জন্য। এই মেয়েটি এসেই গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে। এই মেয়েটির খাদ্য-পানীয়ের ব্যবস্থাও তাকেই করতে হবে ?

তরুণ বললো, এবার ঘরে যাচ্ছি, তোমরা আসবে তো এসো।

যুবতীর হাত ধরে খোকা বেশ বিপদজনকভাবে দুপদুপিয়ে নেমে এলো নিচে। তারপর বললো, আমি দৌড়ে চলে যাচ্ছি আগে। আমার ভীষণ ভীষণ খিদে পেয়েছে।

উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো ভূমিতে খোকা প্রায় চোখের নিমেষে মিলিয়ে গেল।

তরুণ আর যুবতী হাঁটতে লাগলো প্রায় পাশাপাশি, তরুণ একটিও কথা বললো না তার সঙ্গে। যুবতী মাঝে মাঝে অপাঙ্গে তাকাচ্ছে তরুণের দিকে, সে হয়তো কিছু বলতে চায়, কিন্তু প্রথম শব্দটি খুঁজে পাচ্ছে না।

এক সময় সে হঠাৎ কোমর থেকে তার ছুরি শুদ্ধু বেল্টটা খুলে ফেলে তরুণের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, এই যে।

তরুণ প্রথমে ছুরিটা, তারপর মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, কী হবে ?

—এটা তুমি নাও, তোমার কাজে লাগবে।

—ওটা তোমার সঙ্গে যখন দেওয়া হয়েছে, তখন তোমার কাছেই থাকুক।

—আমি ছুরি নিয়ে কী করবো !

—তা আমি জানি না। কিন্তু আমার দরকার নেই।

যুবতীর মুখে অভিমানের ছায়া পড়লো। সে এখন হাঁটার সময় শুধু দেখতে লাগলো নিজের পায়ের নোখ।

ঘরের পেছন দিকে একটা পাথরের সঙ্গে লতা দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা জ্যান্ত কচ্ছপ। শুয়োরের দাঁতের ছুরি দিয়ে তরুণ কাটতে বসলো সেটাকে। প্রথমে কচ্ছপটাকে মেরে ফেলবার জন্য তার গলাটা গিথতে লাগলো বারবার।

যুবতী সেখানে এক পলক দাঁড়িয়েই চলে গেল ঘরের মধ্যে। সে সহ্য করতে পারে না ওসব। খোকা দু' হাঁটুতে হাত দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখছে খুব উৎসাহের সঙ্গে।

যুবতী একটু পরেই আবার বেরিয়ে এসে কোমর থেকে বেল্টটা আবার খুলে বললো, এবার নিলে হয় না ? ছুরি দিয়ে কাটতে অনেক সহজ হবে।

তরুণ মুখ না ফিরিয়েই বললো, এতেই বেশ কাজ চলে যাচ্ছে।

খোকা হাত বাড়িয়ে বললো, আমায় দাও, ছুরিটা আমায় দাও !

তরুণ বেশ কড়া গলায় তাকে ধমক দিল, না !

যুবতী সমুদ্রের কাছে চলে গিয়ে ওদের দিকে পেছন ফিরে বসে রইলো।

কচ্ছপের খোল থেকে সবটা মাংসই-খুবলে খুবলে তুলে নিল তরুণ। খোকা খুব আশ্চর্য হয়ে বললো, ওমা, দ্যাখো, কচ্ছপটা মরে গেছে, তবু ওর মাংস নড়ছে।

তরুণও আগেই এটা লক্ষ করেছে। কচ্ছপের মাংসের এই আলাদা প্রাণশক্তি তার কাছেও বিস্ময়কর লাগে।

মাংসর তালটা নিয়ে উঠে এসে তরুণ কাঠের গুঁড়ির আঁচে ঝলসাতে লাগলো অনেকক্ষণ ধরে। খোকার আর তর সইছে না। এর মধ্যে ঘরে যে দুটো ফল ছিল, তার একটা যুবতীকে দিয়ে এসে অন্যটা সে খেয়ে ফেলেছে। তবু তরুণের রান্নার সময় সে বারবার বলতে লাগলো, হয়েছে ? আর কত দেরি ? একদম হয়ে গেছে কিন্তু !

তরুণ এক সময় এক টুকরো মাংস ছিঁড়ে খোকাকে দিয়ে বললো, খেয়ে দ্যাখ তো, এখনো শক্ত আছে কি না !

খোকা টপাস করে টুকরোটা প্রায় গিলে ফেলে বললো, হ্যাঁ হয়েছে। খুব ভালো আর নরম।

তরুণ তাকে বিশ্বাস করলো না, নিজেও এক টুকরো খেয়ে দেখলো। আরও দু' একবার উল্টে পাল্টে তারপর বললো, চল, বাইরে বসে খাই। এখন তো বৃষ্টি নেই।

তার নিজের গাছ থেকে বেশ কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিল, তারপর তিন জায়গায় মাংস পরিবেশন করে সে এক পাতা মাংস দিল যুবতীকে। তিনজনে বসলো কাছাকাছি।

যুবতী সামান্য সামান্য মাংস ছিঁড়ে মুখে দিল মাত্র কয়েকবার। তারপর চুপ করে বসে রইলো।

তরুণ নিজের খাবার শেষ করে ফেললো বেশ তাড়াতাড়ি। তারপর সে হাত ধুতে গেল সমুদ্রের জলে।

খোকা জিজ্ঞেস করলো, আকাশ, তোমার কী হলো, তুমি খাচ্ছ না?

যুবতী মুখ কুঁচকে বললো, আমার ভালো লাগছে না। আমি এই মাংস খেতে পারবো না। বিচ্ছিরি ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ।

—তা হলে তুমি কী খাবে? আজ তো কাঁকড়া নেই।

—না থাকলে খাবো না।

—ওমা, না খেলে যে তোমার আরও খিদে পাবে। তুমি আরও কাঁদবে।

—এই জঘন্য খাবার তোরা খেলি কী করে রে? ধুৎ!

নিজের মাংসটা পাতায় জড়িয়ে যুবতী ছুঁড়ে ফেলে দিল সমুদ্রের জলে।

তরুণ তা দেখে অবাক হয়ে ঘুরে তাকালো। তারপর সোজা হেঁটে এসে দাঁড়ালো যুবতীর একেবারে সামনে। কর্কশ গলায় জিজ্ঞেস করলো, তুমি ওটা ফেলে দিলে কেন?

—আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

—ইচ্ছে না করলেও তুমি ফেলে দিয়ে নষ্ট করবে?

—বাঃ আমার ইচ্ছে না করলেও জোর করে খেতে হবে নাকি?

—জোর করার কোনো কথা হচ্ছে না। কিন্তু নষ্ট করতে কে বলেছে? জানো, এখানে কত কষ্ট করে খাবার জোগাড় করতে হয়। এই খেয়েই আমাদের বাঁচতে হবে। তুমি না খাও পরে আমরা খেতুম।

পাতায়-মোড়া মাংসটুকু জলে পড়লেও ডুবে যায় নি, একটি ঢেউ সেটাকে ভিজে বালির ওপর রেখে গেছে।

যুবতী সেই মাংসটা তুলে আনবার জন্য উঠতে যাচ্ছিল, তরুণ বললো, থাক, আর তোলার দরকার নেই। একবার সমুদ্রের জল লেগে গেলে নোন্‌তা অখাদ্য হয়ে যায়।

হাঁটু-গেড়ে বসে থাকা অবস্থাতেই অন্য দিকে ঘুরে গিয়ে বালির ওপর উপুড় হয়ে আছড়ে পড়লো যুবতী, তারপর সে প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগলো, আঃ! আঃ! আঃ! আমি মরে যাবো! আঃ! আঃ! আঃ!।

যেন তার বুক ভরা প্রবল কান্না গলার কাছে কোথাও বাধা পেয়ে বেরুতে পারছে না, তাই ওরকম ব্যথার শব্দ বেরুচ্ছে।

তরুণ একটুক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলো সেদিকে। তারপর খোকাকে বললো, আয়, আজ আমার সঙ্গে সমুদ্রে নামবি। তোকে আমি সাঁতার শেখাবো আজ।

খোকা মুখ গোঁজ করে বসেছিল, ঝাঁঝালো গলায় বললো, না, যাবো না!

—তোর আবার কী হলো রে খোকা? উঠে আয়, বলছি সাঁতার শেখাবো তোকে—

—না, আমি যাবো না। কিছুতেই যাবো না। তুমি কেন ওকে ওরকম বিচ্ছিরি ভাবে বকলে? তুমি পাজী লোক।

পলকহীন চোখে খোকার দিকে তাকিয়ে রইলো তরুণ। যেন সে নতুন কোনো দৃশ্য দেখছে। তারপর আচম্‌কা হেসে উঠলো হা হা করে। সে কি প্রচণ্ড হাসি। যেন মঞ্চের ওপর কোনো উন্মাদ।

সেই অদ্ভুত হাসি শুনে যুবতী পর্যন্ত একবার কান্না থামিয়ে বক্র ভাবে তাকালো।

যেমন আচম্‌কা শুরু হয়েছিল হাসি, সেইরকম হঠাৎ থেমে গেল। হাত দিয়ে ঠোঁট মুছলো তরুণ। তারপর খুব শান্ত ভাবে বললো, শোন খোকা, এই ঘরটাতে তোরা থাকিস। তোদের যে খাবার ভালো লাগে তা খুঁজে নিস। আমাকে আর তোদের দরকার নেই। আমি অন্য জায়গায় থাকবো। আমার একা থাকতে ভালো লাগে।

খোকা কোনো উত্তর দিল না।

তরুণ ঘরে ঢুকে শুধু তার কুড়ুল ও শুয়োরের দাঁতের ছুরি নিয়ে বেরিয়ে এলো। তারপর হন হন করে হাঁটতে লাগলো টিলার দিকে।

এর মধ্যেই তরুণের একটা স্মৃতি তৈরি হয়ে গেছে। নদীর মতন খাঁড়ির অগভীর স্বচ্ছ জলের ধারে একটা ছায়াময় স্নিগ্ধ স্থান। একটা বড় পাথরের আড়ালে দুটি হাঁস ডানার জল ঝাড়ছে। এই ছবিটি চুম্বকের মতন টানতে লাগলো তাকে।

তরুণ দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পর খোকা উঠে গিয়ে যুবতীর পিঠে হাত রাখলো। তারপর আস্তে আস্তে ডাকলো, আকাশ! আকাশ!

কোনো সাড়া না পেয়ে সে ওর পাশে শুয়ে পড়লো। তারপর বয়স্ক গলায় বললো, আকাশ তোমাকে আর কেউ বকবে না। তুমি কেঁদো না।

যুবতী এবার উঠে বসলো। তার মুখ পর্যন্ত বালিতে মাখামাখি হয়ে গেছে। সারা গা ও মুখের বালি ঝেড়ে পরিষ্কার করলো। কুটিরের পাশে তাদের নিজস্ব পুকুর থেকে এক-আঁজলা জল নিয়ে ধুয়ে ফেললো মুখটা।

তারপর ফিরে এসে বললো, তুই কী রে খোকা, ও রাগ করে চলে গেল আর তুই ওকে আটকালি না?

খোকা ঠোঁট উল্টে বললো, রাগ করেছে তো ভারী বয়েই গেছে। ও কেন তোমায় বকবে।

—আমি খাবার নষ্ট করেছি, সেই জন্য বকেছে।

—তুমি....তুমি কাঁদছিলে।

—ও বকেছে বলে তো কাঁদিনি। আমি কাঁদছিলুম অন্য কারণে।

—আহা-হা, আমি জানি না বুঝি! ও চলে গেছে, বেশ ভালো হয়েছে। এখানে বেশ তোমাতে আমাতে থাকবো। আমিও কাঁকড়া আর কচ্ছপ ধরতে পারি। জানো তো, কচ্ছপদের উল্টে দিলেই ওরা আর নড়তে পারে না।

—কিন্তু এটা ওর ঘর, ও আমাদের ছেড়ে চলে গেল, এখন ও কোথায় থাকবে?

—ও আর একটা বানিয়ে নেবে !
—তুই ভারী অদ্ভুত ছেলে তো !
—তুমি তো মাংস খেলে না, তুমি কাঁকড়া খাবে ? একটা মোটে কাঁকড়া আছে। চলো, তোমায় পুড়িয়ে দিচ্ছি।
—তোকে কিচ্ছু করতে হবে না। জিনিসটা কোথায় আছে আমায় দেখিয়ে দিবি চল্।
তরুণ সমান গতিতে হেঁটে গিয়ে পৌঁছোলো সেই খাঁড়ির কাছে। হাসগুলো এখন নেই, তবু জায়গাটা তার আগের মতনই আকর্ষণীয় মনে হলো।
প্যান্ট খুলে ফেলে সে স্নান করতে নামলো। জলের আলোড়নের জন্য ছুটে পালাতে লাগলো হাজার হাজার মাছ। এখন তরুণের মাছ ধরা বিষয়ে আগ্রহ নেই। সে সাঁতার কেটে পৌঁছে গেল খাড়ির ওপারে। এদিকটা তত ভালো নয়, বালির চেয়ে পাথরই বেশী। এখানে শুয়ে থাকার আরাম নেই।
তরুণ আবার ফিরে এলো এ পাশে। তারপর নরম ছায়া মিহিন বালিতে শুয়ে রইলো চিৎ হয়ে। মস্ত বড় একটা গাছ ছায়া ফেলে রেখেছে গোটা জায়গাটায়।
পাতার ফাঁক দিয়ে তরুণ দেখতে লাগলো আকাশ। আজ আকাশ এখন ঝকঝকে নীল, এখন বৃষ্টির কথা কল্পনাও করা যায় না। তবু হয়তো এখুনি বৃষ্টি নামবে। এমনিতে আকাশকে খুব বেশী দূরে মনে হয় না, বিশেষত সমুদ্রের দিগন্তে মনে হয় যেন আকাশ জলে মিশে গেছে। কিন্তু এই রকম ভাবে শুয়ে থাকলে আকাশ ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলে যায়। তরুণ ভাবলো, কত দূরে এই আকাশ, কী আছে সেখানে ? তারপরই তরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। এই দ্বীপের বাইরে কী আছে, তা-ই সে জানে না।
কিছুক্ষণ চক্ষু বুজে নিঃসাড়ভাবে সেখানেই শুয়ে রইলো সে। তারপর এক সময় উঠে প্যান্টটা পরে নিল। বিকেল গড়িয়ে এসে রোদের তেজ মরে গেছে। এখানে ঘর বানাতে গেলে জঙ্গল থেকে কিছু কাঠ ও লতা-পাতা আনা দরকার। অন্ধকার হয়ে গেলে আর কিছু করা যাবে না। একটা অবশ্য সুবিধে এই, এখানে বিকেল অনেক প্রলম্বিত।
খানিকটা অনিশ্চিত পায়ে সে হেঁটে চললো জঙ্গলের দিকে। সীমানার কাছে গিয়ে সে সতর্ক হয়ে গেল। কিছু পাখির ডাক ছাড়া জঙ্গলের মধ্যে অন্য কোনো শব্দ নেই।
তরুণের কুড়ুল দিয়ে বড় গাছ কাটা যায় না। আগের জায়গাটায় কয়েকটা পুরোনো গাছের গুঁড়ি পড়ে ছিল, সম্ভবত কোনো এক সময় ঝড়ে উল্টে পড়েছিল। এখানে সে সুবিধে নেই।
একটা কিশোর মতন গাছের গোড়ায় সে কোপ বসালো। কিন্তু আঘাতটা তেমন মজবুত হলো না। আরও দু' তিনটে কোপ মারবার পর সে বুঝতে পারলো তার হাত কাঁপছে, তার শরীরটা দুর্বল লাগছে। কপালে হাত ছুঁয়ে টের পেল বেশ গরম। সেদিন খোকার যেমন জ্বর হয়েছিল, তারও সেইরকম হচ্ছে বোধহয়।

তরুণ জ্বরকে গ্রাহ্য না করে মনোযোগ দিয়ে কাটতে লাগলো গাছটা। এক সময় তার পাথরের ফলাটা খুলে গেল কুড়ুলের বাঁট থেকে। পাথরটার ধারালো দিকের খানিকটা চল্‌টাও উঠে গেছে। আর একটা এই রকম পাথর খুঁজতে হবে।
পুরোনো পাথরটাকেই আবার বেঁধে নিল আপাতত। আজ সন্ধে হবার আগে এটা দিয়েই কাজ চালাতে হবে। ভোতা কুড়ুল দিয়েই সে ধৈর্য ধরে গাছটাকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করে যেতে লাগলো। ক্রমশই তার জ্বর বাড়ছে। তার চোখ জ্বালা করছে, ঝাঁ ঝাঁ করছে সম্পূর্ণ শরীর। এত পরিশ্রমেও ঘাম না বেরিয়ে তার একটু একটু শীত করতে লাগলো।
গাছটা শুয়ে পড়বার পর সেটাকেই সে ডালপালা শুদ্ধু টানতে টানতে নিয়ে এলো নদীর ধারে। এদিকের পাশাপাশি দুটি বড় গাছকে দু' দিকের খুঁটি করা যায়। তাহলে এই গাছটাকে আবার মাঝখান থেকে কেটে আর দুটো খুঁটি বানাতে হবে। তারপর বেড়া বাঁধবার জন্য আরও কিছু ডাল ও লতা চাই।
কিন্তু আজ আর ঘর বানাবার উৎসাহ সে বোধ করলো না। একটা পাথরে হেলান দিয়ে অবসন্নের মতন বসে রইলো। সূর্য এখন জলের মধ্যে আধখানা ডুবেছে। দিগন্তের আকাশ আজ যেন একটু বেশী লাল লাগছে তরুণের কাছে। জলের ওপরেও পড়েছে লক্‌লকে লাল রেখা। সেইদিকে নির্নিমেষে চেয়ে রইলো তরুণ।
তার মুখে কোনো অভিমান নেই। খোকা এবং যুবতীর কথা যেন তার একবারও মনে পড়ে নি। আজ আর বোধহয় বৃষ্টি আসবে না, সে খোলা জায়গাতেই শুয়ে থাকবে।
জ্বরের ঘোরে যখন তরুণের চোখ বুজে এসেছে, সেই সময় খোকা আর যুবতী এসে বসে পড়লো তার দু দিকে। যেন তারা দু' জনেই সমবয়সী।
খোকা বললো, আমি নিজে আজ একটা কচ্ছপ ধরেছি।
তরুণ রক্তাভ চোখ মেলে ওদের দু' জনকে দেখলো, তারপর খোকাকে বললো, ধরেছিস, বাঃ !
খোকা বললো, কিন্তু আমি ওর গলা কাটতে পারি না। ভয় করে। আকাশও পারে না।
—শিখে যাবি, আস্তে আস্তে শিখে যাবি।
—আজ বৃষ্টি হয়নি, আমাদের জল ফুরিয়ে গেছে।
—হবে, বৃষ্টি হবে।
এবারে যুবতী বললো, যার ঘর, সে না থাকলে আমরা কেউ ওখানে থাকবো না।
তরুণের মাথা ঝুঁকে আসছে। সে অস্পষ্ট স্বরে বললো, অভ্যেস হয়ে যাবে, সব অভ্যেস হয়ে যাবে।
যুবতী বললো, এরপর অন্ধকার হলে পায়ে হোঁচট খেতে হবে কিন্তু !
খোকা বললো, রাস্তা হারিয়ে যদি অন্য দিকে চলে যাই ?

তরুণ বললো, সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে চলে যাবি।

—যদি মাঝখানে আমাদের কুকুর তাড়া করে ?

তরুণ এবারে আপন মনে হাসলো। যদি এখানেই এখন কুকুর এসে পড়ে, সে কি লড়তে পারবে ? অসহ্য ব্যথায় তার মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে, শরীরে যেন একটুও শক্তি নেই।

—এই চলো না। অন্ধকার হলে আমার ভয় করবে!

যুবতী বললো, নতুন জায়গা, অন্ধকার···আমি আর কক্ষনো কাঁদবো না, খাবার নষ্ট করবো না।

খোকা বললো, আমরা কেউ আর কাঁদবো না।

তরুণের থুতনি বুকে ঠেকে গেছে, সে আর কোনো কথা বলছে না। সে চাইছে শুধু ঘুম।

খোকা তাকে একবার ঠেলা দিতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চল্!

গা ঝাড়া দিয়ে মনের জোরেই সে হেঁটে চললো। তৃষ্ণায় তার গলা শুকিয়ে আসছে। সে আকাশের দিকে তাকালো। ফিকে অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে উড়ে এসেছে মেঘ। তা হলে আর বৃষ্টির জন্য চিন্তা নেই।

ওরা ওদের ঘরের কাছে পৌঁছোবার আগেই বৃষ্টি নামলো ঝিরিঝিরি। ওদের পুকুরে এখনো জল জমেনি। উপুড় হয়ে শুয়ে তলানির জলটুকুই শুষে নিল তরুণ। তারপর ঘরের মধ্যে ঢুকে বললো, আমার খুব ঘুম পেয়েছে। আমি শুয়ে পড়ছি। খুব বেশী দরকার না হলে আমায় ডাকিস না!

॥ ৭ ॥

সকাল বেলা খোকাই ধাক্কা দিয়ে জাগালো তরুণকে।

এর মধ্যেই খোকা বাইরে গিয়ে সমুদ্রের ধারে অনেকখানি ঘুরে এসেছে। সে সহাস্যমুখে জানালো, এই, আজ কেউ আসে নি! কেউ আসে নি!

যুবতীও খানিকটা আগে উঠে দরজার সামনে বসে সূর্যোদয় দেখছিল, সে বললো, কে আসবে ?

খোকা বললো, আগে ও এসেছিল, তারপর আমি এসেছি। তারপর তুমি এলে। সেইজন্যই ভাবলুম, আজ আবার কেউ আসবে। কিন্তু কেউ আসে নি, আমি দেখে এলুম!

যুবতী বললো, না, আর কারুরুকে দরকার নেই!

খোকা বললো, আর কেউ এলে কিন্তু আমরা এই ঘরে থাকতে দেবো না। আকাশ, আজ ঢেউ-এর সঙ্গে অনেক সুন্দর সুন্দর ঝিনুক উঠেছে, দেখতে যাবে ? চলো না, চলো!

যুবতী ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়ে তরুণকে দেখলো।

তরুণ খানিকটা কুঁকড়ে, গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। তার চোখ লাল। তার উঠবার কোনো ইচ্ছেই নেই যেন।

মেয়েরা তাদের বিশেষ কোনো ইন্দ্রিয় দিয়ে পুরুষদের অসহায় অবস্থার কথা এক নিমেষে টের পেয়ে যায়। যুবতী উঠে এসে তরুণের পাশে বসে পড়ে বললো, তোমার কী হয়েছে!

তরুণের কপালে হাত রেখে বললো, ভীষণ গরম! তোমার তো খুব জ্বর হয়েছে।

তরুণ বললো, ঠিক হয়ে যাবে। কাল রাত্তিরে অনেক বেশী হয়েছিল, এখন কমছে টের পাচ্ছি।

—কাল রাত্তিরে আমাদের কিছু বলো নি কেন ?

তরুণ এ প্রশ্নের উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করলো না।

খোকা বললো, আমার ওর চেয়ে বেশী জ্বর হয়েছিল! অনেক বেশী!

—খোকা, তুই ঝিনুক কুড়োতে যা। আমি একটু এখানে বসি!

—না, তুমি চলো! ও ঘুমিয়ে থাক না। আমি তোমায় খুব ভালো ভালো ঝিনুক দেখাবো···আর যদি কাঁকড়া পাই—

খোকা এসে যুবতীর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলো।

তরুণ বললো, তুমি ওর সঙ্গে যাও। আমি একটু পরে আসছি।

ওরা চলে যাবার পর তরুণ জোর করেই উঠে বসলো। শরীরটা খুবই দুর্বল লাগছে, মাথাটা খুব ভারি। ইচ্ছে করছে শুয়ে থাকতে, আবার তরুণ এটাও ভাবছে যে জোর করে তাকে এই দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলতে হবে। তাদের আর কোনো কচ্ছপ বা কাঁকড়া জমা নেই। তাকে যেতেই হবে খাদ্যের সন্ধানে।

খানিকক্ষণ ঝিম মেরে বসে থাকার পর তরুণ উঠে দাঁড়ালো। তার ধারণা হলো, সমুদ্রের জলে ভালো করে স্নান করলেই তার এই অসুখটা চলে যাবে।

প্রায় টলতে টলতেই দরজার বাইরে এসে দু' এক পা হাঁটার পরই সে থমকে গেল। দারুণ দুশ্চিন্তায় কেঁপে উঠলো তার বুক। তার ঘরের ডান দিকে খানিকটা দূরে সার বেঁধে বসে আছে আটটা কুকুর।

খোকা আর যুবতী একটু আগেই তো বেরুলো। ওদের কিছু হয়নি তো ? কিন্তু তরুণ ওদের কোনো আর্তনাদও শুনতে পায় নি। কুকুরগুলো নিঃশব্দে বসে যেন তরুণেরই প্রতীক্ষা করছে।

দারুণ অবসাদ আর বিষণ্ণতায় ভরে গেল তরুণের মন। এই রকম ভাবে তাকে বাঁচতে হবে। সকালে উঠেই ভাবতে হবে খাদ্যের কথা। মাঝে মাঝেই এই হিংস্র কুকুরের পালের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। ওরা তাকে কোনো সময় অসাবধানে পেলেই ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলবে একেবারে। একবার সে ভাবলো, আসুক, কুকুরগুলো তাকে খেয়ে ফেলুক, তার আর এই ভাবে বাঁচতে ইচ্ছে করে না।

কিন্তু একটা কুকুর উঠে দাঁড়িয়ে পেছনের পায়ে বালি ওড়াতে ওড়াতে কুটিল ভাবে তরুণের দিকে খ্যা খ্যা করে ডেকে উঠতেই তরুণের সমস্ত স্নায়ু চড়াক করে সজাগ হয়ে গেল। সে দৌড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে কুডুলটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসতে না আসতেই সব কটা কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়লো তার ওপর।

কোথা থেকে অসাধারণ শক্তি এসে গেল তরুণের গায়ে। সে লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে বনবন করে ঘোরাতে লাগলো কুডুলটা। কুকুরগুলোও লাফিয়ে তার মুখ ও চোখের ওপরই আক্রমণ করতে চাইছে। তবে কুকুরগুলো আকারে তেমন বড় নয় বলেই অতটা উঁচুতে উঠতে পারছে না। তবু পেছন থেকে কয়েকটা তার পিঠে ও পায়ের ডিমে কামড় বসিয়েছে।

কুডুল নিয়ে কুকুরগুলোকে পেটাতে পেটাতে তরুণ শুধু একটা কথাই ভাবছে, তাকে কোনো ক্রমেই পড়ে গেলে চলবে না। একবার সে শুয়ে পড়লেই এরা তাকে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

খোকা আর যুবতী বেলাভূমিতে ঝিনুক কুড়োচ্ছিল, এক সঙ্গে অত কুকুরের চিৎকার শুনে ওরা ছুটে এলো এদিকে। ওদের আসতে দেখে তরুণ সেই অবস্থাতেই চেঁচিয়ে বললো, তোমরা এসো না। জলে নেমে পড়ো!

তবু ওরা ছুটে এলো। ওদের কাছে অস্ত্র নেই। কিন্তু যুবতীর সাহস আছে, সে একটা পাথর খুঁজে পেয়ে সেটাই তুলে নিয়ে একেবারে কাছে চলে এসে মারতে লাগলো কুকুরদের। খোকা দু'হাতের মুঠোয় বালি তুলে তুলে ছুঁড়তে লাগলো ওদের দিকে। তখন কয়েকটি কুকুর তরুণকে ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো ওদের ওপর।

তরুণ যেন একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে। সে বিদ্যুতের মতন ঘুরে ঘুরে মারছে। সারা শরীর থেকে রক্ত ঝরছে তার। দুটো কুকুরের আক্রমণে যুবতী একবার বসে পড়লো মাটিতে, সেই অবস্থাতেই বুদ্ধি করে সে তার মুখ ঢেকে ফেললো দুই হাঁটুর মধ্যে, দুটো কুকুর আক্রমণ করলো তার পিঠের দিক থেকে। তরুণ ছুটে এসে দুই লাথি মেরে কুকুরদুটোকে সরিয়ে দিল, তারপর আর একটি কুকুরের মাথায় কুডুল দিয়ে এমন জোরে মারলো যে সেটা ছিটকে গিয়ে পড়লো প্রায় দশ হাত দূরে। অন্তিম ডাক ডেকে আর নড়লো না।

একটি কুকুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কুকুরগুলো রণে ভঙ্গ দিল। মৃত সঙ্গীকে ফেলে রেখে তারা তীব্র গতিতে ছুটে গেল জঙ্গলের দিকে।

ওরা তিনজন মাটিতে বসে হাঁপাতে লাগলো। তরুণের শরীর ক্ষত বিক্ষত। তার বাঁ পায়ের ডিম থেকে এক চাকলা মাংস তুলে নিয়েছে, পিঠে অনেক জায়গায় দাঁত বসিয়েছে। যুবতীর পিঠের জামা ভেদ করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর তরুণ ক্লান্ত গলায় বললো, তোমার জামাটা খুলে ফেল।

সামনের দিকে বোতাম, যুবতী নিজেই খুলে ফেললো জামাটা। তরুণ ঝুঁকে পড়ে

দেখলো, যুবতীর পিঠে কুকুরের দাঁত দু'জায়গায় বেশ গভীরভাবে বসেছে।

—জ্বালা করছে?

—খুব। তোমার তো আরও বেশী লেগেছে।

—আমি খুব একটা ব্যথা টের পাচ্ছি না। বোধহয় জ্বরের জন্য। তোমরা শুধু শুধু এলে কেন?

—আমরা না এলে তুমি একা পারতে ওদের সঙ্গে?

খোকা চোরা চোখে একবার দেখছে যুবতীর সুডৌল স্তন, তারপরই চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে, আবার দেখছে। তার প্রতি কেউ মনোযোগ দিচ্ছে না বলে সে এবার বললো, আমাকেও কামড়েছে। খুব জোরে। আমার বেশী লেগেছে।

তরুণ আর যুবতী দু'জনেই এক সঙ্গে ফিরলো খোকার দিকে। তার গোড়ালিতে একটা কুকুর কামড়ে দিয়েছে ঠিকই।

তরুণ বললো, ইস, তাই তো! খুব জোরে কামড়েছে। খোকা কিন্তু খুব সাহসের সঙ্গে লড়াই করেছে।

খোকা বললো, আমার হাতে লাঠি ছিল না, নইলে ....।

—এবার থেকে ঘর থেকে বেরুবার সময় সব সময় হাতে লাঠি রাখবি। ওরা এসেছিল আমাদের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করতে।

তরুণ উঠে গিয়ে মরা কুকুরটাকে দেখলো। তার রক্তে ভিজে গেছে অনেকখানি বালি। ছোটখাটো চেহারা হলেও কুকুরগুলো অসম্ভব তেজী, এখনো এর মৃত মুখে হিংস্রতার ছাপ লেগে আছে। গায়ের ঝাল মেটাবার জন্য তরুণ সেই মৃতদেহটায় একটা লাথি কষালো। তারপর শট্ মারতে মারতে নিয়ে গেল জলের কাছে। এটার কিছু ব্যবস্থা করা এখন শক্ত হবে। জলে ফেলে দিলেও ঢেউ ওকে ফিরিয়ে দেবে বারবার। তার চেয়ে সুবিধে, বালির তলায় পুঁতে ফেলা।

তরুণ যুবতীকে সত্যি কথা বলে নি। তার ক্ষত থেকে এত যন্ত্রণা হচ্ছে যে সে যেন চোখে অন্ধকার দেখছে মাঝে মাঝে। জ্বালার চোটে সে নেমে গেল জলে। লোনা জল লেগে তার যন্ত্রণা বেড়ে গেল বহুগুণ। কিন্তু সে যেন আত্মনিপীড়নের ব্রত নিয়েছে, কিছুতেই মুখে টু শব্দ করবে না। ঐ ব্যথা নিয়েই সে দাপাদাপি করতে লাগলো জলে।

যুবতী উপুড় হয়ে শুয়ে আছে বালিতে। খোকা তার ক্ষতস্থানে ফুঁ দিচ্ছে।

ভিজে গায়ে উঠে এসে তরুণ খোকাকে জিজ্ঞেস করলো, তুই যে কাল একটা কচ্ছপ ধরেছিলি, সেটা কোথায়?

খোকা অপরাধীর মতন হাসলো। অর্থাৎ সে মিথ্যে কথা বলেছে।

যুবতী মুখ ফিরিয়ে বললো, চেষ্টা করেছিল, ধরতে পারে নি।

—তাহলে আজ আর খাওয়া হবে না। আজ আমার শিকার করার শক্তি নেই।

সারা সকাল, সারা দুপুর ওরা নিস্পন্দ অবস্থায় শুয়ে রইলো বালির ওপরে। খোকার অবশ্য এত ধৈর্য নেই, সে এক সময় উঠে গেছে আপন মনে ঝিনুক কুড়োচ্ছে আর কথা

বলছে তাদের সঙ্গে।

তরুণ কিছুক্ষণ নজর রেখেছিল খোকার দিকে। খোকা কিন্তু একবারও জঙ্গলের দিকে যাবার চেষ্টা করে নি। এবারে সত্যি সত্যি ওর ভয় ধরেছে। খোকা একবারও খেতে চাইছে না।

বিকেলের দিকে তরুণের নিজেরই খুব খিদে পেয়ে গেল। কিংবা অন্য দু'জনের খিদে সে অনুভব করলো নিজের শরীরে। জ্বরজ্বরভাবটা এখনো আছে।

সে উঠে দাঁড়িয়ে খোকাকে বললো, দেখে আসি চল্, দেখে আসি কচ্ছপ এসেছে কি না।

খোকা দুলকি চালে লাফাতে লাফাতে চললো ওর সঙ্গে। তরুণ পেছন ফিরে একবার মরা কুকুরটাকে দেখলো। সে কোন অনুভূতি দিয়ে বুঝেছে যে ওটাকে খাওয়া ঠিক উচিত হবে না। কিন্তু কোনো খাবারই যদি না পাও যায়, তাহলে চেষ্টা করে দেখতে হবে।

একটুখানি গিয়ে খোকা ফিসফিস করে বললো, আকাশ তো কচ্ছপ খাবে না।

—অন্য খাবার আমি কোথায় পাবো!

কচ্ছপরা আজ আসে নি। এদিক ওদিক অনেক খোঁজাখুঁজি করলো দু'জনে। তরুণের শরীরটা খারাপ বলে মনটাও তেতো তেতো লাগছে। এই ব্যর্থতা সে মেনে নিতে পারছে না। একটু হাঁটতে শুরু করার পর তার পায়ের ক্ষততে আবার বিষম ব্যথা শুরু হয়েছে।

খোকা এক জায়গায় বালি থেকে একটা জিনিস তুলে নিয়ে বললো, দ্যাখো, কী সুন্দর পাথর।

এবার তরুণের চোখ চকচক করে উঠলো। সেটা পাথর নয়, ডিম। কচ্ছপেরই ডিম হবে। তরুণ তক্ষুনি সেখানে বসে বসে বালি খুঁড়তে লাগলো। সবশুদ্ধু পাওয়া গেল পাঁচটা ডিম, আর একটা ভাঙা খোলা।

তরুণ বললো, এবার থেকে তোর ওপর ভার রইলো বালির মধ্যে সব সময় এই জিনিস খুঁজবি। এটা খুব ভালো খাবার। তোর আকাশও খাবে।

একটা ডিম ভেঙে তক্ষুনি কাঁচাই খেয়ে ফেললো তরুণ। আর একটা ভেঙে খোকাকে বললো, হাঁ কর। কী, ভালো খেতে না?

খোকা বললো, হুঁ, আর একটা খাবো?

—না, বাকিগুলো তোর আকাশের জন্য রেখে দে। এখানে আরও পাস কি না খুঁজে দ্যাখ। কোনো কথা বলবি না, একটুও শব্দ করবি না।

গোটা পাঁচেক পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে তরুণ গুঁড়ি মেরে এগোতে লাগলো জলের দিকে। সে একটা হাঁসের ডাক শুনতে পেয়েছে।

তীর থেকে খানিকটা দূরে জলের ওপর দুটো হাঁস মুখোমুখি অবস্থায় পরস্পরের প্রতি মুগ্ধভাবে তাকিয়ে আছে। ঢেউ আসছে, তারা সমানভাবে দুলে উঠছে, কিন্তু চোখ

সরাচ্ছে না। আকাশে সূর্য রক্তিম হয়ে এসেছে, সেই আলোতে সাদা ধপধপে হাঁসদুটিকেও লালচে দেখাচ্ছে।

একটা পাথরের মতন নিঃস্পন্দ হয়ে বসে আছে তরুণ। তার চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে, দুটি নয়, সে দেখছে শুধু একটি হাঁসকে। কুকুরের আক্রমণ থেকে বাঁচার মতনই এখন একটি হাঁসকে খুন করার ওপর যেন তার জীবনমরণ নির্ভর করছে।

একটা ঢেউ চলে যাবার পর একটু শান্ত হতেই সে তার সব শক্তি দিয়ে একটা পাথর ছুঁড়ে মারলো। সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সে উড়ন্ত হাঁসদুটির মধ্যে তার নির্দিষ্টটিকেই শুধু লক্ষ করে ছুঁড়তে লাগলো অন্য পাথরগুলোকে।

তার মধ্যে একটা লাগতেই হাঁসটি পড়ে গেল জলে। তক্ষুনি সেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। লোনা জল লেগে আবার জ্বালা করে উঠলো তার ক্ষত, কিন্তু তার বোধ নেই, জলের ওপর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে সে ধরে ফেললো হাঁসটিকে।

বিশাল হাঁসটি ডানা ঝাপটে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো তরুণকে। অন্য হাঁসটি তার মাথায় ঠোক্কর মারছে, কিন্তু কিছুই গ্রাহ্য করছে না তরুণ। জয়ের সাফল্যে তার শরীরে মত্ত হস্তীর বল এসেছে, ঢেউ ও ডানার ধাক্কায় সে এক একবার পড়ে যাচ্ছে জলে, কিন্তু হাঁসটাকে কিছুতেই ছাড়ছে না।

তীরে উঠে আহত হাঁসটিকে পায়ের তলায় চেপে ধরে সে তার কুড়ুলটি তুলে নিয়ে মারবার চেষ্টা করলো দ্বিতীয় হাঁসটিকে। ঠুকরে ঠুকরে তরুণের মাথায় রক্ত বার করে দিয়েছে হাঁসটা, এবারে সে তীব্র স্বরে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল জঙ্গলের দিকে।

খোকাও ততক্ষণে এসে পৌঁছে গেছে সেখানে। সে তরুণ ও হাঁসটিকে ঘিরে নাচতে শুরু করে দিল, এবং সেই উৎসাহের চোটে ভেঙে ফেললো তার পকেটের দুটো ডিম। হাঁসটার দুটো ডানা মুচড়ে এবং তার ধারালো চঞ্চু ভালো ভাবে চেপে ধরে তরুণ বললো, চল্।

যুবতী রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। খোকা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললো, আকাশ দ্যাখো, দ্যাখো, আমরা কী এনেছি।

যুবতী মুখ ফিরিয়ে দেখলো জয় ও গর্বে মেশা তরুণের মুখ। চন্দনের ফোঁটার মতন ঘামের বড় বড় বিন্দুতে সেই মুখ সাজানো। তার বুকের ওপর চেপে ধরা অপরূপ সিন্ধু সারস। তার গ্রীবাতেই পাথরের আঘাত লেগেছে, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। এখনো সে প্রবল শক্তিতে ঝটপটিয়ে উঠছে বারবার।

যুবতী বললো, ও মা, কী সুন্দর! বেঁচে আছে।

উঠে এসে সে ওর ডানায় নরম ভাবে হাত বুলিয়ে বললো, একে বেঁধে রাখলে থাকবে না? আমরা ওকে পুষবো!

তরুণ ঘুরে দাঁড়িয়ে যুবতীর দিকে পেছন ফিরে হাঁসটির গলা মুচড়ে দিল।

যুবতীও এদিকে চলে এসে নিরাশ ভাবে বললো, একি, তুমি মেরে ফেললে?

তরুণ ওর মুখের দিকে স্থির ভাবে তাকালো। যেন সে বলতে চাইলো, দয়া, মায়া

এই সব শৌখিনতা খালি পেটে মানায় না। কিন্তু এই ভাষা তার মুখে এলো না।
মরা হাঁসটিকে যুবতীর পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে সে বললো, এবার তুমি কাটো।
তারপর সে আস্তে আস্তে বসে পড়লো মাটিতে। তারপর শুয়ে পড়েই অজ্ঞান হয়ে গেল।
যুবতীও তার পাশে বসে পড়ে বললো, কী হলো? তুমি রাগ করলে?
দারুণ উৎকণ্ঠার সঙ্গে সে তরুণের মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়ে দু'গালে ছোট ছোট চাপড় মারলো। টেনে দেখলো চোখের পাতা। সে বুঝতে পারলো।
—খোকা, জল নিয়ে আয় তো।
—জল? কিসে করে আনবো?
যুবতী একটু চিন্তা করে বললো, কচ্ছপের খোলা আছে না ঘরের পেছন দিকে? ওতে করে জল নিয়ে আয়।
—সমুদ্রের জল না পুকুরের জল?
—পুকুরের জল।
খোকা জল নিয়ে আসবার পর যুবতী আঁজলা করে তুলে তরুণের চোখে ছিটিয়ে চাপড়ে দিতে লাগলো।
খোকা জিজ্ঞেস করলো, ওর কী হয়েছে? ও মরে গেছে?
—চুপ কর, ওরকম কথা বলতে নেই।
—ওর মাথায় রক্ত। অন্য হাঁসটা ঠুকরে দিয়েছে।
যুবতী সেখানেও জল দিতে লাগলো। তারপর বৃষ্টি এসে গেল।
যুবতী বললো, খোকা, তুই ওর পায়ের দিকটা ধর তো, ওকে তুলে ঘরের মধ্যে নিয়ে যাই।
দু'জনে মিলে ধরে তুলতেই তরুণের জ্ঞান ফিরে এলো। সে চোখ মেলে বললো, কী হয়েছে?
যুবতী বললো, কিচ্ছু হয় নি। তুমি ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকবে। আমরা অন্য সব কাজ করবো।
—বৃষ্টিতে বেশ আরাম লাগছে। নামিয়ে দাও, কিছুক্ষণ বৃষ্টিতে শুয়ে থাকি।
—না, তোমার গায়ে জ্বর, এখন বৃষ্টি ভেজা চলবে না। তোমার প্যাণ্টাও ভিজে রয়েছে।
—আগুনের পাশে বসে থাকলেই শুকিয়ে যাবে। খোকা, আমার পায়ের ঐ জায়গাটা ধরিস না, আমার লাগছে। আমায় ছেড়ে দে, আমি হেঁটে যেতে পারবো।
ঘরে গিয়ে তরুণ শুয়েই পড়লো। বললো, হাঁসটার পালক ছাড়াও। সবটা মাংস আজ পোড়াবার দরকার নেই। অদ্ধেকটা রেখে দিও।
এমন সময় বিরাট শব্দে মেঘ ডাকলো।
তরুণ ক্লান্ত ভাবে বললো, বৃষ্টি পড়লে একটা ভালো কি জানো, সেই সময়

কুকুরগুলো বেরোয় না, আমার খালি মনে হচ্ছে, ওরা আবার আসবে। ওদের যদি বুদ্ধি থাকতো, তাহলে ওরা আজই বিকেলে আবার আসতো। তা হলে আমরা শেষ হয়ে যেতুম।
যুবতী বললো, কেন শেষ হবো? অত সোজা নয়। কাল তুমি আমায় একটা কুড়ুল বানিয়ে দিও।
খোকা বললো, আমাকেও।
যুবতী তার কোমরের খাপ থেকে ছুরিটা খুললো। সেটার ধার পরীক্ষা করতে করতে বললো, খোকা, হাঁসটা নিয়ে আয়।

॥ ৮ ॥

মহাশয়া বললেন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। একটা কিছু করা যায় না? আপনাদের সাবমেরিনকে বলুন না—
প্রথম বললেন, মহাশয়া, বাইরে থেকে সাহায্য পাঠানো হলে এই পরীক্ষাটার কোনো মানেই থাকে না।
মহাশয়া বললেন, কিন্তু...ওরা যদি মরে যায়?
—সেটাই তো আমরা দেখছি, মানুষের বেঁচে থাকবার ক্ষমতা কতখানি?
—তা বলে মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলবেন?
—মহাশয়া, পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে গেছে। সেই হিসেবে ওরা তো ভাগ্যবান। ওরা নিজেদের নিয়তি নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করছে। ওরা যদি মরেও যায়, তবু ওরা জানবে যে ওদের মৃত্যুর কারণ ওদের নিজেদেরই ব্যর্থতা। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইতে ওরা হেরে গেছে।
—কুকুরে কামড়াবার জন্য লোকটির পায়ে দগদগে ঘা হয়ে গেছে। ওর নিশ্চয়ই র‍্যাবিস হয়েছে।
—সে রোগের সময় পেরিয়ে গেছে, নইলে ওর শরীর বেঁকে যেত। তা ছাড়া, যত দূর মনে হয়, জঙ্গলের কুকুরের র‍্যাবিস থাকে না, ওটা শহুরে কুকুরদের রোগ।
কবি বললেন, ঠিক বলেছো। ওটা সভ্য জগতের রোগ। ছেলেটা না জেনে ঐ যে কুকুরে কামড়াবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রে নেমেছিল, তাতে ওর উপকারই হয়েছে। নোনা জলে বীজাণুমুক্ত হয়েছে। মেয়েটা আর খোকারও বিশেষ কিছু হয়নি।
একটু থেমে মুচকি হেসে কবি আবার বললেন, তোমরা মেয়েটিকে কিন্তু খুব ভালো বেছেছো। ওর বক্ষ দুটি বড় সুন্দর, এমন সহসা দেখা যায় না।
দ্বিতীয়া বললেন, আমরা ইচ্ছে করে ওরকম মেয়ে বাছিনি। ঐ রকমই এসেছে।

মহাশয়া সচকিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এসেছে মানে ? কোথা থেকে এসেছে ? আপনারাই তো পাঠিয়েছেন। ওকে কোথা থেকে পেয়েছেন ?

প্রথম বললেন, ওদের পরিচয় জানাবার এখনো সময় হয়নি। যথা সময়ে ঠিক জানতে পারবেন।

মহাশয়া খুবই অস্থির হয়েছেন, তিনি টি ভি পর্দার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, তা বলে ওরা না খেয়ে থাকবে দিনের পর দিন ? ছোট ছেলেটা পর্যন্ত—।

এর মধ্যে পাঁচ দিন কেটে গেছে। আর নতুন কিছুই ঘটেনি বলে টি ভি পর্দায় দ্বীপটির দৃশ্য দেখা বৈজ্ঞানিক ও পর্যবেক্ষকদের পক্ষে খুবই ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে। কবি তো কাল সারা দিন এ ঘরে আসেনই নি। তিনি বলেছিলেন, ঐ একঘেয়ে জিনিস আর কী দেখবো। বিশেষ কিছু হলে আমায় ডেকো। মহাশয়াও কাল ঘুমিয়েছেন অনেকক্ষণ।

আজ একটু আগে তাঁরা সবাই সমবেত হয়েছেন এই ঘরে।

দৃশ্য সেই একই। সেদিন বিকেলে ঐ হাঁসটিকে মারার জন্যই কিনা কে জানে, ওখানকার প্রকৃতি বেশ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। সেই যে সেদিন বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, তারপর আর থামে নি। প্রথম দিন সারা রাত অল্প অল্প বৃষ্টি হয়েছে, দ্বিতীয় দিন থেকে বৃষ্টিতে তেজ বাড়তে শুরু করেছে। গত দু' দিন ঝড় ও বৃষ্টি চলেছে অবিরাম। এত দুর্যোগের মধ্যে বাইরে বেরুবার কোনো উপায় নেই, হাওয়ার ঝাপটায় উল্টে উল্টে ফেলে দেয়।

সেই হাঁসের বাকি মাংসটা দু'দিন ধরে খেয়েছে ওরা। গতকাল থেকে ওদের আর কোনো খাদ্য নেই। সম্পূর্ণ উপোস চলছে। তরুণ এই অবস্থার মধ্যেও কয়েকবার ঘুরে এসেছে বাইরে। তাতে সে অসুস্থ শরীরে আর একটু আহত হয়েছে। এই আবহাওয়ায় কাঁকড়া, হাঁস, কচ্ছপ কিচ্ছুর দেখা নেই। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু আশ্রয় আছে নিশ্চয়ই, এই সময় কেউ-ই সে আশ্রয় ছেড়ে বাইরে বেরোয় না। কিন্তু হাঁস, কচ্ছপ, কাঁকড়া জাতীয় প্রাণীরা নিজেদের খাদ্য জোটায় কী করে এই রকম সময়ে ? কিংবা ওদের কোনো কষ্ট বোধ নেই, মানুষই শুধু উপোস সহ্য করতে পারে না ?

খোকা কিন্তু খেতে না পেয়েও একটুও কাঁদে নি। বরং তার মুখে একটা আতঙ্কের ছাপ, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ধৈর্য কম, সে যেন ভাবছে এই ঝড় বৃষ্টির সংঘাত কোনো দিনই আর থামবে না।

একটি বালকের এই উপবাসের দৃশ্য দেখে সবচেয়ে বেশী কষ্ট পাচ্ছেন মহাশয়া। তিনি গতকাল রাত্রে নিজের ডিনার না খেয়ে উঠে গিয়েছিলেন। রাত্রেও তিনি ঘুমোতে পারেন নি, দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছেন বারবার।

মহাশয়া আবার বললেন, শেষ পর্যন্ত আপনারা ওদের না খাইয়ে মেরে ফেলবেন ? এই দেখবার জন্য আমাদের ডেকে এনেছেন ?

প্রথম বললেন, এই ঝড়-বৃষ্টি আমরা তৈরি করিনি ! আমাদের অনুমানের মধ্যেও ছিল না। যদিও সমুদ্রের মাঝখানে এরকম কয়েকদিনের জন্য একটানা ঝড়-বৃষ্টি

অস্বাভাবিক কিছু নয়।

তৃতীয় বললেন, পারমাণবিক বিস্ফোরণ হলেও এরকম প্রলয়ের মতন ঝড় ও বর্ষণ বেশ কিছুদিন চলবে। অন্তত দেড়মাস।

মহাশয়া বললেন, তা হলে মানুষের তো আর বাঁচবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আপনারা যা বলছেন, তাই যদি হয়, তা হলে এই পৃথিবী নামের গ্রহ থেকে মানুষ একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

তৃতীয় বললেন, এখনো এদের দেখে অতটা নিরাশ হবার সময় আসে নি। মানুষ অন্তত সত্তর-আশীদিন কিছু না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে। এরকম নজির আছে।

মহাশয়ার নিষেধ সত্ত্বেও কবি চুরুট খাওয়ার অভ্যেস একেবারে ছাড়তে পারেননি। এই মুহূর্তে একটা চুরুট ধরিয়ে তিনি বললেন, আচ্ছা, একটা কথা আমার মনে হচ্ছে...এই রকম দুর্যোগ যদি আরও কিছুদিন চলে, ওরা যদি কোনো খাদ্য না পায়, তা হলে ওরা নিজেদেরই খেতে শুরু করবে না তো ?

প্রথম বললেন, সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আদিম মানব সমাজে ক্যানিব্যালিজিম যে ছিল, তার নিশ্চিত প্রমাণ আছে। এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও অনগ্রসর দু'একটি জাতির মধ্যে...

দ্বিতীয়া বললেন, অনগ্রসর জাতির কথা কেন বলছো, প্রথম ? মনে নেই, সেই আল্‌পস পাহাড়ের ঘটনা ?

প্রথম বললেন, হ্যাঁ, আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে আল্‌পস পাহাড়ে একটি বিমান ভেঙে পড়েছিল এবং সেই বিমানটির দুই শতাধিক যাত্রীর মধ্যে সতেরো জন বেঁচে গিয়েছিল কোনো ক্রমে। উদ্ধারকারীদের সেই বরফের রাজত্বে পৌঁছোতে লেগেছিল প্রায় তিন সপ্তাহ। ততদিনে, খাদ্যের অভাবে, সেই লোকগুলি তাদের সঙ্গীদের মৃতদেহ খেয়েছে। তারা সবাই কিন্তু ছিল সুসভ্য পাশ্চাত্যদেশীয়। 'টাইম' নামে তৎকালীন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় এই বিবরণ লেখা আছে।

তৃতীয় বললেন, আমি আরও একটা ঘটনা বলতে পারি। এটা অবশ্য সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়নি, কিন্তু এই ঘনিষ্ঠ আসরে বলা যায়। উনিশ শো পঁচাশি সালে চাঁদে যখন প্রথম উপনিবেশ গড়ার চেষ্টা হয়, তখন সেখানে একবার দেড় মাসের মধ্যে কোনো সরবরাহ যান পৌঁছোয় নি। এবং বাতানুকূল ব্যবস্থার আকস্মিক বিপর্যয়ের ফলে সমস্ত সংরক্ষিত খাদ্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তখন ঔপনিবেশিক অভিযাত্রীরা তাদের একজন সঙ্গীকে, সে তখন মরে নি, মুমূর্ষু ছিল, তাকে হত্যা করে তার মাংস খেয়ে বেঁচে থেকেছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বাঁচার জন্য কাল্‌চারাল ফ্যাক্টরও কিছু না।

কবি আপন মনে বললেন, তা হলে ওরা প্রথমে ছোট ছেলেটিকেই খাবে।

মহাশয়া ক্রন্দন জড়িত কণ্ঠে বললেন, প্লীজ, কবি, এমন কথা বলবেন না।

মহাশয়ার এই আর্ত অনুরোধের কোনো উত্তর না দিয়ে কবি খুব কৌতূহলী চোখে

তাকালেন ওর দিকে।

প্রসঙ্গটা একটু বদলাবার জন্য দ্বিতীয়া বললেন, একটা জিনিস লক্ষ করেছেন ? ঐ তরুণ অর্থাৎ একজন যুবাবয়স্ক পুরুষ কোনো নারীর সান্নিধ্য বা সাহচর্য ছাড়াই বেশ কিছুদিন বেশ অনায়াসেই কাটাতে পারে। কিন্তু একটি অল্পবয়েসী ছেলে তা পারে না। ঐ বাচ্চা ছেলেটি ঐ যুবতী মেয়েটিকে পেয়ে কেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল প্রথম থেকেই।

প্রথম বললেন, তা ঠিক। পুরুষের শৈশব ও কৈশোর নারীসঙ্গ বঞ্চিত হলে কিছুতেই তা স্বাভাবিক হতে পারে না। আসলে প্রেম জিনিসটার উন্মোচনই তো হয় পিউবার্টির সময়। এইজন্যই অল্পবয়সী ছেলেরা একটু বেশী বয়েসের মেয়েদের প্রতি আসক্ত হয়। তাদের মধ্যে তারা একটি পরিপূর্ণ নারীকে দেখতে পায়।

কবি বললেন, তা তো হলো। কিন্তু একটা ব্যাপার আমায় বেশ ধাঁধায় ফেলেছে। ঐ ছোকরাটি মেয়েটির ব্যাপারে এত নিরাসক্ত কেন ? যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। এ রকম করলে প্রোক্রিয়েশন হবে কী করে ? প্রকৃতিরই তো উচিত ছিল ওর ঘাড় ধরে বংশ রক্ষার ব্যবস্থা করার।

তৃতীয় হেসে বললেন, এখনো কিন্তু খুব বেশীদিন কাটে নি।

প্রথম বললেন, তবু, কবি যেন ঠিকই বলেছেন। যুবকটির উদাসীনতা যেন একটু বেশী বেশী না ? ও সত্যি আমাদের আশ্চর্য করেছে।

কবি বললেন, আমার ধারণা ছিল, প্রকৃতি যেখানে নগ্ন, অর্থাৎ আকাশ যেখানে বিশাল, সমুদ্র যেখানে সীমাহীন, অরণ্য যেখানে রহস্যময়, অর্থাৎ মানুষ যেখানে অনেকখানি উন্মুক্ততার মধ্যে বসে থাকে, সেখানে তার যৌন কামনাও খুব সুতীব্র হয়।

মহাশয়া ক্লিষ্ট কণ্ঠে বললেন, ওরা খেতে পাচ্ছে না, ওরা এত কষ্ট পাচ্ছে, তবু এ সময় আপনাদের এইসব কথা মনে হচ্ছে ?

কবি এবারে ভর্ৎসনার সুরে বললেন, মহাশয়া, তুমি কি সত্যিই এত সরলমতি ? একথাও কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে যে তুমি জানো না, ক্ষুধার্ত উদরেই যৌন-তাড়না বেশী হয় ? পৃথিবীর দরিদ্র দেশগুলির সবচেয়ে নিচেরতলার দম্পতিদেরই সন্তান সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ?

মহাশয়াও উত্তপ্ত স্বরে বললেন, সন্তান সংখ্যা বেশী মানেই যে···

কবি উচ্চস্বরে হা-হা শব্দে অট্টহাস্য করলেন। তারপর বৈজ্ঞানিক তিনজনের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরাও তো বাপু কম অস্বাভাবিক নও ! এ রকম আকাশে উড্ডীন অবস্থায় মাসের পর মাস রয়েছো, তোমাদেরও কি যৌন-জীবন বলতে কিছু নেই ? এ তো স্বাভাবিক নয়।

প্রথম কিছুটা লঘু হাস্য করে বললেন, আমরা এখানে কৃত্রিম হাওয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিই, কৃত্রিম খাদ্য খাই, সুতরাং সব ব্যাপারেই আমরা এখানে কৃত্রিম জীবনযাপন করি।

কবি দ্বিতীয়ার চোখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার

আগেই দ্বিতীয়া বললেন, আজকের কুরিয়ার সার্ভিসে এ সপ্তাহের নিউজ লেটার এসেছে, তা দেখেছেন কী ?

কবি বললেন, না, দেখিনি। আমরা তো এই একটা ছোট্ট দ্বীপ নিয়েই মগ্ন আছি। বাদবাকি পৃথিবীর খবর কী ?

খবর বেশ খারাপ। সপ্তম নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক গত সোমবার ভঙ্গ হয়ে গেছে। বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি একমত হতে পারেনি।

কবি বললেন, নতুন কিছু নয়। পৃথিবীর সব মানুষ কোনোদিনই কোনো ব্যাপারে একমত হতে পারবে না।

দ্বিতীয়া বললেন, আর একটি বড় খবর, কার্ল ফ্রিডমান, যিনি প্রোটো-নিউট্রন বোমার আবিষ্কারক, এবং এ বছর যিনি পদার্থবিদ্যার জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনি গতকাল আত্মহত্যা করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর দু' জন সহকারীও !

এ সংবাদে সকলেই কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেলেন। কার্ল ফ্রিডমান বর্তমান দশকের সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিক। তিনি বিপুল ধন-সম্পদেরও উত্তরাধিকারী এবং তাঁর বয়েস মাত্র একান্ন। সুতরাং তাঁর মতন মানুষের আত্মঘাতী হওয়ার সংবাদ সহজে মেনে নেওয়া যায় না।

নীরবতা ভঙ্গ করে কবিই প্রথমে বললেন, এক হিসেবে ভালোই হয়েছে। নইলে ওঁকেও বিবেকের যন্ত্রণায় ভুগতে হতো আইনস্টাইনের মতন। তোমরা জানো নিশ্চয়ই, দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণকারী বৈজ্ঞানিক অ্যালবার্ট আইনস্টাইন সেখানকার রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কাছে আবেদন করেছিলেন, পরমাণু বিভাজন শক্তি গবেষণার ব্যবস্থা করে দেবার জন্য। তাঁর ভয় ছিল, হিটলার নামে নর-দানবটি আগেই তার বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে ঐ অস্ত্র বানিয়ে ফেলবে। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তখন যুদ্ধের কোনো সম্পর্ক ছিল না। তবু রুজভেল্ট রাজী হয়েছিলেন। কিন্তু হিটলার বানাতে পারেনি, বানাবার চেষ্টা করেছিল এমনও প্রমাণ নেই। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন বিপুল অর্থ ব্যয়ে এই পরীক্ষায় সার্থক হলো এবং সত্যিই এই মহা-বিধ্বংসী অস্ত্র বানাতে সমর্থ হলো, তখন এর ভয়াবহতা অনুভব করে আইনস্টাইন এই অস্ত্র প্রয়োগ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর মতন বৈজ্ঞানিকের অনুরোধে কেউ কর্ণপাত করেনি। অবশ্য রুজভেল্ট তখন মৃত এবং টুপী-বিক্রেতার মতন চেহারার রাষ্ট্রপতি ট্রুমানের অতখানি তলিয়ে বোঝবার ক্ষমতাই ছিল না।

দ্বিতীয়া বললেন, শুধু তাই-ই নয়, যুদ্ধ তখন প্রায় শেষ, ঐ অস্ত্র প্রয়োগের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। তাও মূল শত্রু জার্মানদের ওপর প্রয়োগ করা হয়নি, কারণ তারা স্বজাতি ও শ্বেতাঙ্গ ; প্রয়োগ করা হয়েছিল, হলুদ জাতি জাপানীদের ওপর। হিরোসিমা ও নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ নিরীহ নির্দোষ মানুষ মারা যায় কিছুই না জেনে।

প্রথম বললেন, দ্বিতীয়া, আমরা রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্মী। কোনো বিশেষ রাষ্ট্রের প্রতি

দোষারোপ করা আমাদের কর্তব্য নয়।

দ্বিতীয়া একটু ক্ষুব্ধভাবে বললেন, আমরা তো বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাস আলোচনা করছি।

কবি জিজ্ঞেস করলেন, শুধু খারাপ খবরই শোনাচ্ছো। কোনো ভালো খবর নেই পৃথিবীর ?

দ্বিতীয়া বললেন, একটা ছোট্ট খবর আছে, হয়তো তার গুরুত্ব অপরিসীম।

—কী সেটা ?

—ফিলিপিন্‌সের কৃষি গবেষণা কেন্দ্র এমন একরকম গমের বীজ আবিষ্কার করেছে, যার নাম দিয়েছে ম্যাজিক সীড, যা দিয়ে মাত্র কুড়ি দিনে গমচাষের ফসল পাওয়া সম্ভব। এবং এক একটা গাছের উৎপাদন বর্তমান উৎপাদনের সতেরো গুণ বেশী। গাছগুলি ছোট ছোট, বেশী জল কিংবা সার প্রয়োগেরও বেশী দরকার নেই।

তৃতীয় বললেন, অর্থাৎ ফ্ল্যাটবাড়িতে কয়েকটি টবে গমের চাষ করলেও একটি পরিবার তাদের সারা মাসের খাদ্য পেতে পারবে। সুতরাং জনসংখ্যা যতই বাড়ুক, পৃথিবীতে আর কারুরই অনাহারে থাকতে হবে না।

প্রথম বললেন, এক হিসেবে এই যুগটাই মানুষের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ সময়। উই নেভার হ্যাড ইট সো গুড। সমুদ্রের তলায় খামার গড়ে তোলার ফলে সামুদ্রিক প্রোটিনের বিশাল ভাণ্ডার উন্মুক্ত হয়েছে। ক্যানসারেরও ওষুধ আবিষ্কৃত হওয়ায় সমস্ত অসুখ-বিসুখই এখন দমিত। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের গড় আয়ু এখন ছিয়াত্তর।

কবি বললেন, আর কোনো শত্রু নেই বলেই মানুষ এখন নিজেই নিজেকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। আমরা আর একবিংশ শতাব্দী দেখে যেতে পারবো না।

মহাশয়া বললেন, আপনাদের এই ধ্বংস-বাতিক আমি মোটেই বিশ্বাস করতে পারছি না। মানুষ কখনো এত উন্মাদ হতে পারে না। একটা কিছু উপায় বেরুবেই।

প্রথম বললেন, মহাশয়া, অস্ত্রসম্ভার এখন এমন এক জায়গায় পৌঁছেছে যে ইচ্ছে থাকলেও আর সেগুলোকে নিবৃত্ত করা যাবে না। এগুলি ডিসম্যানটেল করার ক্ষমতা বৈজ্ঞানিকদেরও নেই। তা করতে গেলে যে তেজস্ক্রিয় বিকীরণ শুরু হবে, তাতেই আমরা সকলে রক্তবমি করতে করতে মরে যাব। গত বৎসর মেক্‌সিকো সীমান্তে সতেরো হাজার ব্যক্তির অকস্মাৎ রহস্যময় মৃত্যুর সংবাদ শুনেছিলেন ? তার কারণও ঐ। একটা অতি সাধারণ, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী পারমাণবিক চুল্লির যে তেজস্ক্রিয় আবর্জনা, তার সংস্পর্শে এসেই কতগুলো মানুষ মরেছে। এরকম তেজস্ক্রিয় আবর্জনা অনেক মরুভূমিতে পুঁতে রাখা হয়েছে, সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার বিষ একদিন না একদিন ছড়াবেই।

তৃতীয় বললেন, এর চেয়েও আরও অনেক ভয়াবহ চিত্র দেওয়া যায়, কিন্তু মহাশয়াকে আর ভয় দেখিয়ে লাভ নেই।

মহাশয়া তবু দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, আমি মোটেই ভয় পাচ্ছি না। সেরকম দুর্দিন যখন

আসবে তখন আসবে, তাবলে এখন থেকেই আমি নৈরাশ্যে ভুগতে রাজী নই। এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার নামে আপনারা এই ছেলেমেয়েগুলোকে না খাইয়ে মেরে ফেলবেন, তাও আমি সহ্য করবো না। এখুনি এই পরীক্ষা বন্ধ করুন, ওদের ফিরিয়ে আনুন।

প্রথম বললেন, এখন আর বন্ধ করা সম্ভব নয়।

—আমাদের বিশেষজ্ঞ হিসেবে ডেকে এনেছেন, আমি বলছি, এই পরীক্ষা বন্ধ করতে হবে।

—মাফ করবেন, মহাশয়া, সে অধিকার আপনাদের দেওয়া হয়নি। আপনারা শুধু মতামত দিতে পারেন, কিন্তু পরীক্ষা চলাকালীন মাঝখানে আপনারা হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

—বাঃ, আপনারা একটা কিছু সর্বনেশে কাণ্ড করে ফেলবেন, তারপরে আমাদের মতামত দেবার কী মূল্য আছে ? আমি ইনসিস্ট্‌ করছি, আমার প্রতিবাদ এখনি উচ্চতর কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হোক।

—সে ব্যবস্থা হতে পারে। আপনার প্রতিবাদ লিখে দিন, কাল সকালেই কুরিয়ার সার্ভিসে আর্থ স্টেশনে পাঠিয়ে দেবো। অবশ্য আমরা এখানে যে দৃশ্য দেখছি, সেটাই রিলে করে আর্থ স্টেশনে পাঠানো হচ্ছে, সেখানেও কয়েকজন দেখছেন। ওঁরা এখনো পর্যন্ত কোনো আপত্তি জানাননি।

দ্বিতীয়া হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বললেন, এবারে দেখুন, দেখুন !

খোকা, যুবতী আর তরুণ চোখ বুজে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। ওদের কোনো গল্প নেই, কথা নেই। এই স্পন্দনহীন ও শব্দহীন দৃশ্য দেখবার মতন কিছু ছিল না।

কিন্তু এইমাত্র তরুণ উঠে দাঁড়ালো। কয়েক পলক সে তাকিয়ে দেখলো ঘুমন্ত খোকা ও যুবতীর দিকে। তারপর কুঠারটি তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

সঙ্গে সঙ্গে ছবি ফুটে উঠলো দ্বিতীয় টি ভি'র পর্দায়। অর্থাৎ একই সঙ্গে ঘরের মধ্যে ও বাইরের দৃশ্য দেখা যেতে লাগলো দুটি টি ভি'র পর্দায়। আকাশ-যানের বৈজ্ঞানিক ও পরিদর্শকরা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন দুটোই।

ঝড়ের ধাক্কায় দু' তিনবার উল্টে পড়ে গেল তরুণ। তারপর কোনোক্রমে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। বৃষ্টির ছাঁট তীরের মতন বিঁধছে তার গায়ে। যে গোল-পাতা গাছটির আশ্রয়ে তাদের ঘরটি বানানো, তার একটি বড় ডাল ভেঙে পড়েছে, তবে সৌভাগ্যবশতঃ ঘরটির ওপরে পড়েনি।

গাছটির চেহারা বেশ মজবুত ধরনের। এখানে বেশী ঝড় হয় বলে জঙ্গলের গাছগুলিও এরকম। তবু কিছু কিছু গাছের ডাল ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে।

তরুণ সেই ভাঙা ডাল থেকে কয়েকটি পাতা ছিঁড়ে নিয়ে চিবিয়ে দেখেই থুঃ থুঃ করে ফেলে দিল, তারপরই বমির মতন ওয়াক তুললো কয়েকবার।

মহাশয়া বললেন, ইস্‌ !

দ্বিতীয়া বললেন, এদিকে দেখুন।

অন্য পর্দায় দেখা গেল, যুবতীও জেগে উঠেছে। সে খোকাকে দেখলো, তারপর দেখলো তরুণের শূন্য জায়গাটা। সে দরজার কাছে উঠে এসে বাইরে মুখ বাড়িয়েও তরুণকে খুঁজে পেল না। সমস্ত মুখে ব্যাকুল দ্বিধা নিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

সমুদ্রের একেবারে ধারে চলে গেছে তরুণ। এখন আকাশ আর সমুদ্র দু' জনেই উন্মাদ। প্রকাণ্ড থাবার মতন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে ঢেউ। আকাশ নিশ্চয়ই অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, কারণ ওপর দিকে তাকিয়ে কিছুই দেখা যায় না।

কবি জিজ্ঞেস করলেন, আমরা ঠিক ওদের মাথার ওপরে রয়েছি, তাই না?

প্রথম বললেন, হ্যাঁ।

কবি বললেন, এখানে কিন্তু আমরা ঝড়-বৃষ্টি কিছুই টের পাচ্ছি না। দেখো, বাইরে কেমন মেঘহীন নীল আকাশ। ওখানে অত দুর্যোগ, তবু ছবি কিন্তু পরিষ্কার আসছে।

প্রথম বললেন, সেইজন্যই তো এই জায়গাটা বেছে নেওয়া হয়েছে।

মহাশয়া বললেন, কিছু নেই, কোনো খাবার নেই।

তরুণ ঘাড় নিচু করে বেলাভূমিতে কাঁকড়া খুঁজে চলেছে। কিন্তু তারা সবাই ভূমির অন্ধকার জঠরে লুকিয়ে রয়েছে এখন।

ঝড়ের বেগটা সব সময় সমান নয়। মাঝে মাঝে খুব জোর হয়ে আবার হঠাৎ একটু কমে যাচ্ছে। খুব জোরের সময় এক একবার মুখ থুবড়ে পড়ে যাচ্ছে তরুণ, আবার একটু শান্ত হলে উঠে দৌড়চ্ছে।

যেখানটায় কচ্ছপরা আসে, সেখানেও কিছু নেই এখন। তরুণ ঠিক ঝড়ের মধ্যে একটা শুকনো পাতার মতন এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো।

কবি বললেন, এরকম সাংঘাতিক ঝড়-বৃষ্টি আমি জীবনে কখনো দেখিনি। এ যেন বাইবেলের প্রলয় বর্ণনার মতন।

তৃতীয় বললেন, এত ঝড়েও ওদের ঘরটি ভেঙে পড়েনি, এটাই আশ্চর্য।

প্রথম বললেন, পাথরগুলোর আড়াল পেয়েছে। হাওয়ার গতি উল্টোদিক থেকে। বুদ্ধি করে ওরা ঘরটা বেশী উঁচু করেনি।

এবারে তরুণ একটা বড় পাথরের ঢিবির গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তাতে সে বৃষ্টির হাত থেকে না বাঁচলেও ঝড়ের ধাক্কা থেকে রক্ষা পেল খানিকটা। চোখ তুলে দেখলো, দূরে একটা মানুষের মূর্তি টলতে টলতে আসছে এদিকে।

ঠিক অন্ধের মতন সামনের দিকে দু' হাত বাড়িয়ে আসছে যুবতী। যেন তার চোখ নয়, হাত দুটোই খুঁজছে কারুকে। সে একটা অবলম্বন চায়। মাঝে মাঝে মুখ তুলে সে বুক চেরা আওয়াজে ডাকছে, এই! এই! কোথায় তুমি?

ঝড়ের শব্দে তার ডাক কোথাও পৌঁছোচ্ছে না। ঝড় তাকে ঠিক লাট্টুর মতন ঘুরিয়ে ফেলে দিচ্ছে বালির ওপর। সে আবার উঠে দাঁড়াচ্ছে, তরুণকে কোথাও দেখতে না-পেয়ে সে আবার ডাকছে, এই, এই, তুমি কোথায় গেলে?

কবি আপনমনে বললেন, একটি চিরকালের ছবি।

আমাদের আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত চিড়ে গেল নীল রঙের আলোয়। তার একটু পরে শোনা গেল প্রচণ্ড বজ্র গর্জন। যুবতী হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে। তারপর আর উঠলো না।

মহাশয়া আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলো নাকি? কেউ উত্তর দিল না এ প্রশ্নের।

পাথরের সঙ্গে লেপ্‌টে দাঁড়িয়ে তরুণ দেখছে যুবতীকে। খানিকক্ষণের মধ্যেও সে উঠে দাঁড়ালো না দেখে তরুণ ছুটে গেল তার দিকে।

তরুণ গিয়ে তুলে ধরলো যুবতীকে। সে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়নি, বেঁচে আছে। তার ঠোঁট নড়ছে। ওরা কথা বলছে দু' জনে, কিন্তু ঠোঁট নড়াই শুধু দেখা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে না কিছুই।

ঝড়ের মধ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় ওদের সেই আলাপ শোনার জন্য ব্যাকুল হয়ে মহাশয়া তাকালেন বৈজ্ঞানিকদের দিকে। ওঁদের একজন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, কিছুই করার নেই।

তরুণ যুবতীকে ধরে ধরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করলো পাথরটার কাছে। দু' জনেই একসঙ্গে আছাড় খেয়ে পড়লো কয়েকবার। পড়ে যাবার পর মেয়েটি উঠতে পারছে না, তরুণ তাকে টেনে তুলছে। শেষ পর্যন্ত তারা পাথরটার আড়ালে পৌঁছে গিয়ে হাঁপাতে লাগলো। যুবতী শক্ত করে চেপে ধরে আছে তরুণের কাঁধ।

একটু দম নেবার পর তরুণ ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, তুমি এলে কেন?

যুবতী তরুণের চোখে স্থির চোখ রেখে বললো, তুমি কেন এলে?

তরুণ একটু বিরক্ত ভাবে বললো, খোকা একলা রয়েছে, তোমার ওখানে থাকা উচিত ছিল।

—আগে বলো, তুমি কেন এলে?

—আমাকে জঙ্গলে যেতে হবে।

—এখন...জঙ্গলে যাবে?

—হ্যাঁ।

—ঐ দ্যাখো, দ্যাখো...

দু' জনেই মুখ তুলে ওপরে দেখলো। একটা গাছের ডাল ঝড়ে উড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। তারপর আর একটা।

তরুণ বললো, তুমি ঘরে ফিরে যাও। যদি ঘরটা ভেঙে পড়ে। খোকা চাপা পড়ে যাবে, একলা বেরুতে পারবে না।

—তুমিও চলো।

—আমি জঙ্গল থেকে ঘুরে আসছি।

—এখন যেও না, লক্ষ্মীটি।

—তুমি একলা ঘরে ফিরে যেতে পারবে, না তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসবো ?

—তুমি যদি যাও, তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

—না, দু' জনের যাবার দরকার নেই। খোকার কাছে একজনের থাকা দরকার, ও হঠাৎ জেগে উঠে ভয় পাবে।

তারপর কণ্ঠস্বর ভারি করে হুকুমের সুরে তরুণ বললো, যাও—।

যুবতী একবারও তরুণের চোখ থেকে চোখ সরায়নি। এবার সে কোমর থেকে ছুরি সমেত বেল্টটা খুলে দিয়ে বললো, তুমি এটা নাও !

তরুণ ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বললো, আচ্ছা, এটা আমি নিচ্ছি। তুমি এবার ফিরে যাও !

যুবতী তরুণের পায়ের কাছে বসে পড়ে ওর পায়ের ডিমে কুকুরে কামড়ানোর জন্য যেখানে ঘা হয়ে আছে, সেখানে আলতো ভাবে চুমু খেল।

তরুণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি এরকম করছো কেন ?

তরুণের দুই জানু ধরে ওপরের দিকে তাকিয়ে যুবতী জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমাদের জন্য খাবার খুঁজতে জঙ্গলে যাচ্ছো, তাই না ?

—শুধু তোমাদের জন্য কেন ? আমার জন্যও।

—এখন যেও না

—আমাকে যেতেই হবে। আরও কয়েকদিন না খেয়ে থাকলে আমাদের শক্তি কমে যাবে, তখন আর কুকুরগুলোর সঙ্গে লড়াই করতে পারবো না। বাঁচতে গেলে এখনই শেষ চেষ্টা করতে হবে।

—আমাকেও নিয়ে চলো তোমার সঙ্গে।

—অবুঝের মতন কথা বলো না। ফিরে যেতে বলছি, ফিরে যাও। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে একা জঙ্গলে ঢুকবো, অন্য কোনো ছোটখাটো প্রাণী দেখলে মেরে আনবার চেষ্টা করবো।

—আমি একলা ফিরে যেতে পারবো না। আমার ভীষণ ভয় করছে।

—চলো, আমি তোমাকে খানিকটা পৌঁছে দিচ্ছি। ওঠো, আমার কাঁধ ধরে থাকো।

সবে মাত্র তারা কয়েক পা এগিয়েছে, তারপরই আকাশ থেকে একটা বজ্র ধমক আসতেই দু'জনে পড়ে গেল এক সঙ্গে। এবারে যুবতী খিলখিল করে হেসে উঠলো, হাসতে হাসতে সে মাটিতে গড়াতে লাগলো।

যুবতী মেয়েদের আকস্মিক হাসির মর্ম পুরুষরা কোনোদিনই বুঝতে পারে না। তরুণ সঙ্কুচিত ভাবে চেয়ে রইলো যুবতীর দিকে।

যুবতী একটু বাদে হাসি থামিয়ে উঠে বসলো। তারপর তার জামার বোতাম খুলে জামাটা ছুঁড়ে দিল এক পাশে। তরুণের দিকে পরিপূর্ণ চোখ মেলে তাকিয়ে বললো, তুমি আমাকে দেখো !

তরুণ যুবতীর পিঠে হাত রেখে বললো, তোমার ঘা অনেকটা শুকিয়ে গেছে।

যুবতী তরুণের মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে বললো, তুমি আমার মুখের দিকে তাকাও।

তারপর সে তরুণের একটি হাত তুলে নিজের বামস্তনের ওপর রেখে বললো, হয়তো কাল সকালের আগেই আমরা মরে যাবো। ঝড়-বৃষ্টি আরও বাড়বে, আমাদের শেষ করে দেবে।

তরুণ বললো, তা হতেও পারে। তবু বাঁচতে ইচ্ছে করে।

—তোমার খুব খিদে পেয়েছে না ? তুমি আমাকে খাও।

গভীর বিস্ময় ফুটে উঠেছে তরুণের মুখে। সে কথাটাকে আক্ষরিক অর্থে নিয়েছে। সে বললো, আমি তোমাকে খাবো ? না, না, তুমি বরং আমাকে খাও !

তরুণী ঝুঁকে এসে তরুণের রোদ-বৃষ্টি-সমুদ্রে ছাপ আঁকা বুকে মুখ রাখলো। প্রথমে আলতো ভাবে চুমু খেল সারা বুকে। তারপর সে তরুণের ওষ্ঠে, চোখে, কপালে, পিঠে, হাতে, পায়ে চুমু দিতে লাগলো চোখ বুজে। যেন সে কিছু খুঁজছে।

তরুণের উত্তেজিত পুরুষাঙ্গ যেন তার ট্রাউজার্স ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে, যুবতী একবার ঠোঁট ছোঁয়ালো সেখানেও।

তারপর মুখ তুলে বললো, তুমি জঙ্গলে গেলে আর ফিরে নাও আসতে পারো। তুমি মরে গেলে আমরা কী করে বাঁচবো ? আমি আর খোকা ?

তরুণ উদাসীনভাবে বললো, তবু আমাকে যেতেই হবে।

আর একবার বিদ্যুৎ-চমক ও বজ্রের শব্দ হতেও যুবতী এবার একটুও চমকালো না বা কেঁপে উঠলো না। সে কাতরভাবে বললো, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না এখন। তুমি আমাকে বাঁচতে দাও।

হঠাৎ যেন বৃষ্টি ও ঝড়ের দাপট দুটোই বেড়ে গেল এক সঙ্গে। এ রকম বৃষ্টির মধ্যে কোনো কথাই বলা যায় না। তরুণ উঠে, যুবতীর হাত ধরে ছুটে এলো আগেকার পাথরটার আড়ালে। তরুণ পাথরে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো, যুবতী হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে তরুণের প্যান্টের কোমরের বোতাম খুলে ফেললো।

তরুণও তার পাশে বসে পড়ে বললো, তোমার কথাই কি সত্যি। এ বৃষ্টি আর থামবে না ?

—যদি মরে যাই, আমরা এক সঙ্গে মরবো। তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে থেকো।

—আর খোকা ? তার কি হবে ?

—ঝড়-বৃষ্টি কি ওকেও মারবে ? কারুর কি কোনো দয়া মায়া নেই ?

—আকাশ, আমার খুব ইচ্ছে করছে তোমাকেও বাঁচিয়ে রাখতে।

—তুমি আমাকে বাঁচাও। তুমি আমাকে বাঁচাও !

—তাহলে তুমি এখানে বসো। আমি জঙ্গলে যাই একবার। একটা কিছু নিয়ে আসবোই ঠিক।

তরুণ ওঠার উদ্যোগ করতেই যুবতী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেললো তাকে।

তারপর তরুণের মুখটা জোর করে চেপে ধরলো নিজের বুকে।

যুবতীর স্তনবৃন্তে মুখ দেওয়ামাত্র তরুণ শিশু হয়ে গেল। সে এক হাত রাখলো যুবতীর মাথার চুলে। যুবতী তার ডান হাতের পাঁচ আঙুলের নোখ দিয়ে নরম আঁচড় কাটতে লাগলো তরুণের পিঠে।

তারপর তরুণ মুখ তুলতেই যুবতী তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সে তার লাল রঙের জিভটা বার করে চাটতে লাগলো তরুণের বৃষ্টি ভেজা গাল। একবার সে তার জিভটা প্রবিষ্ট করে দিল তরুণের দুই ঠোঁটের মধ্যে। এইরকমভাবে তাদের মুখ যুক্ত হয়ে রইলো খানিকক্ষণ।

এক সময় নিশ্বাস নেবার জন্যই বিযুক্ত হলো ওরা। কেননা ওদের নাকও নাকের সঙ্গে ঠেকে গিয়েছিল।

তরুণ এবার আস্তে আস্তে বললো, আমি জানি না, এর আগে তোমার মতন আর কোনো মেয়েকে আমি আদর করেছি কি না।

যুবতী বললো, আমরা যেন মাত্র কয়েকদিন আগে জন্মেছি। আমাদের আগের কিছুই নেই। আমাদের আর কেউ নেই। শুধু তোমার জন্য আমি আছি, আমার জন্য তুমি আছো।

যুবতী তার প্যান্ট খুলে কোমর থেকে নামিয়ে দিল নিচের দিকে। তরুণ গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখলো তার রক্ত-মাংসের পবিত্রতার মতন ঊরুদ্বয়। তার গাঢ় খয়েরি রঙের রোম।

তরুণ আস্তে আস্তে বললো, তোমার নাম আকাশ। কিন্তু মাথার ওপরে যে আকাশ, সে কত নিষ্ঠুর। অথচ তুমি এত কোমল। এত সুন্দর ...

যুবতী বললো, আমি যদি আকাশ হই, তুমি তা হলে সমুদ্র। কেননা, এখানে তো আকাশ আর সমুদ্র ছাড়া আর কেউ নেই।

তরুণ যুবতীর বাঁ দিকের স্তনে এবার নিজে থেকেই হাত রেখে বললো, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। কেন, আমরা বাঁচতে পারবো না?

—আমরা যেটুকু সময় বেঁচে আছি, এসো সেইটুকু সময়ই বেঁচে থাকি।

—আশ্চর্য, তোমার পাশে বসে থাকতে আমার খুব ভালো লাগছে। আমার শরীর তোমাকে চাইছে।

—আশ্চর্য!

—এতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

—আমার খুব ইচ্ছে করছে তোমার বুকের এই জায়গাটায় মুখ রাখি। রাখবো?

—রাখো। এক্ষুনি রাখো।

—তারপর তুমিও আমার বুকে তোমার ঠোঁট জিভ ছুঁইয়ো। কিংবা, কে আগে? তুমি না আমি?

—তুমি, তুমি!

তরুণ যুবতীর বাম স্তন নিজের মুখের মধ্যে নিয়ে জিভ বোলাতে লাগলো। এবার আর সে শিশু নয়। তার হাত দুটি চলে গেল যুবতীর কোমরের নিচে। যুবতীর হাতও দুই পাখির মত তরুণের ঊরুতে খেলা করতে লাগলো।

তারপর সেই দু'জন মানব-মানবী ঝড়, বৃষ্টি ও সমুদ্রের দাপাদাপি তুচ্ছ করে দিল।

দ্বিতীয়া একটু আগেই উঠে গিয়েছিলেন টি ভি পর্দার সামনে থেকে। ঘরের কোণে একটা ছোট বাক্সের মতন যন্ত্র আছে, তাতে অনবরতই নানা রকমের লাল রঙের বিন্দু ও সবুজ রঙের রেখা খেলে যায়। দ্বিতীয়া এখন পর্দার ছবির বদলে মন দিয়ে দেখছেন সেই রেখা ও বিন্দুগুলো।

এক সময় তিনি বলে উঠলেন, পাল্‌স রেট একশো পঞ্চাশ, ব্লাড প্রেশার, ওরে বাবা, এ যে দেখছি দুশো পঞ্চাশ, আর নিশ্বাস প্রশ্বাস খুবই দ্রুত—

প্রথম জিজ্ঞেস করলেন, টেম্পারেচার কত বলতে পারো?

—না, সেটা ধরা যাচ্ছে না।

তৃতীয় বললেন, আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি, মেয়েটির স্তনের আকার পঁচিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এরিওলা বৃত্তের রং অনেক গাঢ় হয়েছে। নিপ্‌ল-এর উচ্চতা বেড়েছে এক সেন্টিমিটার, আর ডায়ামিটার বেড়েছে আধ সেন্টিমিটার। কানের লতি, নাকের ফুটো বিস্ফারিত হয়েছে অনেকখানি, মাপটা ঠিক বলতে পারছি না, ঠোঁটও অনেক পুরু হয়েছে—

কবি মুখ ফিরিয়ে হতভম্বের মতন প্রশ্ন করলেন, এসব কী? এসব কী বলছো তোমরা?

তৃতীয় বললেন, পরিপূর্ণ অরগাজ্‌মের সময়ের অবস্থাটা স্বাভাবিক কি না চেক করছি।

দ্বিতীয়া বললেন, স্বাভাবিক বলছো, তৃতীয়? ব্লাড প্রেসার উঠেছে আড়াই শো, দেড়শোর বেশি ক'জনের ওঠে? পাল্‌স বীট একশো পঞ্চাশ থেকে এক শো ষাট, এরকম অরগাজ্‌ম অনেক ভাগ্যের ব্যাপার, কয়েক কোটিতে একবার হয়।

কবি তবু বিমূঢ় ভাবে বললেন, ওদের পাল্‌স বীট, ব্লাড প্রেসার এসব তোমরা টের পাচ্ছো কী করে?

তৃতীয় বললেন, দ্বীপে পাঠাবার আগে খুব ছোট্ট একটা কমপিউটার ক্যাপসুলে মুড়ে ওদের খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। তার থেকেই ওদের সব রকম শারীরিক পরিবর্তন রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে ঐ যন্ত্রে।

কবি বললেন, এই রকম একটা দৃশ্যেও তোমরা ব্লাড প্রেসার, পালস বীটের হিসেব করছো? তোমরা কি মানুষ, না তোমরাও যন্ত্র হয়ে গেছ?

দৃশ্যটির শেষ দিকে মহাশয়া মাথা নিচু করে ছিলেন। এবারে তিনি হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। সকলে চমকে তাকালেন তাঁর দিকে।

কবি উঠে গিয়ে মহাশয়ার সিল্কের মতন চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন, তুমি

খুব মনে আঘাত পেয়েছো, তাই না ? আমরা এক জোড়া ছেলে-মেয়ের অতি ব্যক্তিগত ও নিভৃত দৃশ্য দেখে ফেললুম বলে ?

মহাশয়া তাঁর অশ্রুসিক্ত ও অসহায় ধরনের মুখখানা তুলে ধরে বললেন, না, সে জন্য নয়। আমার কষ্ট হচ্ছিল অন্য কথা ভেবে। যা দেখলুম, তা যেন স্বপ্নের মতন। এমন সরল, অনাবিল ভাবে শারীরিক মিলন। এ তো আমরা কবে ভুলে গেছি ! কোনো মানুষই তো আর অন্য কারুকে এমন ভাবে ভালোবাসতে পারে না। সবাই শুধু নিজেকেই ভালোবাসে।

কবি বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো। এখন তো প্রেম মানে বড় জোর দশ মিনিটের ব্যাপার। প্রথমেই জামা-কাপড় খোলা।

—আমরা কেন এরকম হয়ে গেলুম বলুন তো ?

—আমরা অভিশপ্ত। আমরা এখন শুধু চামড়ার আনন্দ পাই। হৃদয় ও শরীরকে এক সঙ্গে মেলাতে আমরা ভুলে গেছি।

—আমরা মুখে একশোবার ভালোবাসার কথা উচ্চারণ করি। ওরা কিন্তু একবারও ভালোবাসার কথা বললো না।

—আমিও দেখতে দেখতে ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলুম।

মহাশয়ার চোখ আবার সজল হয়ে এলো। তাঁর মতন নীতিপরায়ণা ও নিয়ম অনুবর্তিনী রমণীর এ রকম দুর্বলতা সত্যিই বিস্ময়কর।

তিনি অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, এত সুন্দর, এত অবিস্মরণীয়, এত উদ্ভাসনময়, আপনারা যে আমাকে এখানে আসার সুযোগ দিয়েছেন, সে জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

তৃতীয় বিনীত ভাবে বললেন, আপনারা এসেছেন, সে জন্য আমরাই ধন্য। এখন এখানে একজন অবজারভেশনে থাক, চলুন, আমরা বরং ডিনার সেরে নিই।

মহাশয়া বললেন, আমায় মাপ করবেন। আপনারা যান। ওরা যতক্ষণ খেতে না পায়, ততদিন আমিও কিছু খাবো না ঠিক করেছি।

কবি বললেন, মহাশয়া, তুমি বড় বেশী টেন্‌স হয়ে আছো। তুমি আমার সঙ্গে একটু অন্য জায়গায় চলো। তোমার সঙ্গে নিভৃতে আমার কিছু কথা আছে।

মহাশয়া দপ্‌ করে জ্বলে উঠে বললেন, নিভৃতে ? তার মানে ঐ দশ মিনিটের ব্যাপার তো ? না ! আমি জীবনে আর কখনো ঐ জিনিস মেনে নেবো না ? আমরা কি আপনাদের সম্পত্তি ? যখন আপনাদের ইচ্ছে হবে—

কবি কোনো তর্কে যেতে না চেয়ে এবার দ্বিতীয়ার দিকে ফিরে বললেন, তুমি আমার সঙ্গে একটু আসবে ?

দ্বিতীয়া উঠে দাঁড়িয়ে অন্য দু'জন সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কবির সঙ্গে যাবো কি ? তোমরা অনুমতি দেবে ? আমার মনে হয় কবির একটু নিভৃত সংলাপ বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে।

প্রথম ও তৃতীয় এক সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই !

ওরা চলে যাবার পর মহাশয়া তাঁর চোয়াল শক্ত করে আবার টি ভি'র পর্দার দিকে মন দিলেন।

তরুণ ও যুবতী নগ্ন শরীরে, ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে কিন্তু স্বর্গীয় সুধা মাখা মুখ নিয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে। তারা একটাও কথা বলছে না। ঝড় ও বর্ষণ অবিরাম চলছে।

অন্য একটি পর্দায় শুধু খোকার ঘুমিয়ে থাকার দৃশ্যই দেখাচ্ছিল। এবার ছবি সেখান থেকে সরে গেল। দেখা গেল বেলাভূমিতে আবছা অন্ধকারের মতন কী যেন একটা নড়ছে। তারপর মনে হলো একটা বেশ বড়সড় মানুষের মূর্তির মতন। সে হেলে দুলে হাঁটছে।

মহাশয়া সেদিকে একবার চোখ ফেলেই বললেন, ও কী ? ও কে ?

প্রথম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এবারে আসছে সাবজেক্ট নাম্বার ফোর।

॥ ৯ ॥

মানুষটির চেহারা প্রায় গোরিলার মতন, উচ্চতা বেশী নয়, চওড়া মতন, পাথরে কোঁদা শরীর। মুখ ভর্তি দাড়ি, পরনে একই রকম রঙের ট্রাউজার্স।

সে অনেকক্ষণ বেলাভূমিতে শুয়ে শুয়ে বৃষ্টিতে ভিজেছে, তারপর কিছুক্ষণ দিগ্‌ভ্রান্তের মতন ঘোরাঘুরি করেছে এদিক ওদিক, তারপর সে একবারের বিদ্যুৎ চমকে দেখতে পেয়েছে গাছের নিচে ঘরখানি।

বৃষ্টি বা ঝড়ের ধাক্কাকে সে গ্রাহ্য করছে না একেবারেই। সে ঘরখানির কাছে এসে দরজার কাছে দাঁড়ালো। ভেতরটা অন্ধকার-অন্ধকার। কাঠের গুঁড়ির আগুনটা নিভে গেছে। বাইরের দুর্যোগের জন্য কত বেলা তাও বোঝবার উপায় নেই।

আগন্তুকটি গলা দিয়ে ভল্লুকের মতন একটা শব্দ করলো। সে আবছার মধ্যে খোকাকে দেখতে পেয়েছে।

খোকা কিন্তু ঘুমন্ত নয়। ক্ষুধার্ত পেটে একটানা গভীর ঘুম সম্ভব নয়। সে তরুণ এবং যুবতীকে উঠে যেতে দেখেছে, তবু সে নিজে বাইরে যেতে চায় নি। ঝড়ের গর্জনে তার ভয় হয়। এক এক সময় তার তন্দ্রা আসে, আর মাঝে মাঝে চোখ মেলে সে দলে দলে কাঁকড়া ও কচ্ছপের আনাগোনার দৃশ্য কল্পনা করে।

আগন্তুকটি ঘরের মধ্যে ঢুকে খোকার মাথার কাছে বসে পড়লো। তারপর সবল দু'হাতে তাকে তুলে ধরে চোখের কাছে এনে দেখলো।

অকস্মাৎ তন্দ্রা ভেঙে ঐ রকম একটি অপরিচিত মুখ দেখে খোকা চিৎকার করে উঠলো, আঁ, আঁ, আঁ !

আগন্তুকটি সঙ্গে সঙ্গে খোকাকে নামিয়ে রেখে আবার সে জানোয়ারদের মতন একটা

দুর্বোধ্য শব্দ করলো।

খোকা মাটিতেই গড়াতে গড়াতে চলে যেতে চাইলো দরজার দিকে। লোকটি কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগলো ওকে। তারপর খোকা বাইরে চলে যেতেই লোকটিও বাইরে এসে দাঁড়ালো কোমরে হাত দিয়ে।

এই কয়েকদিনে খোকা অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছে, ঝড়ের সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা তার নেই। একটুখানি গিয়েই সে পড়ে যাচ্ছে। এবং খোকা যতবারই পড়ে যাচ্ছে, ততবারই আগন্তুকটি দৌড়ে গিয়ে তুলে দিচ্ছে আর মুখ দিয়ে শব্দ করছে অদ্ভুত ভাবে।

খোকা আরও ভয় পেয়ে হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর করে দূরে সরে সরে যাওয়ার চেষ্টা করছে তার থেকে।

খোকা ভুল করে চলে গেল বেলাভূমির দিকে। এখান থেকে তরুণ ও যুবতী অনেক দূরে।

এখানে এসে খোকা আর একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখলো। প্রায় বারো-চোদ্দটি বিরাট আকারের কিছু হামাগুড়ি দিচ্ছে বালিতে। কাছাকাছি জলও তোলপাড় হচ্ছে, যেন ওখানে রয়েছে ঐ রকম আরও অনেক প্রাণী। খোকার মনে হলো আরও ঐ রকম ভয়ঙ্কর মানুষের দল এসেছে।

আকাশে সূর্য নেই, চাঁদ নেই, দিন নেই, রাত্রি নেই। অদ্ভুত এক রকমের ঘোর ঘোর ভাব। ঝড়ের শব্দটাও বদলে গেছে, যেন প্রবল একটা শিসের শব্দ আসছে কোথা থেকে।

জীবনের চরমতম ভয়ে খোকা একটা বুক ফাটা আওয়াজ করলো। সমুদ্রের ধারে এরকম মানুষের মতন বড় প্রাণী সে কখনো দেখে নি, আর একটা দাড়িওয়ালা অচেনা লোক তাকে তাড়া করছে। তার বদ্ধমূল ধারণা হলো, এরা আগেই তরুণ আর যুবতীকে মেরে ফেলেছে, এবার তাকে শেষ করে ফেলবে।

নিছক আত্মরক্ষার জৈবিক তাড়নাতেই খোকা এঁকেবেঁকে অন্য দিকে ছুটলো।

আগন্তুকটিও ঐ বিশাল প্রাণীগুলোকে কৌতূহলের সঙ্গে দেখলো কয়েক পলক। কিন্তু সে-ও শুধু অনুভূতি-চালিত হয়েই চললো খোকার পেছনে পেছনে।

সমুদ্রের ধারের ঢালু জায়গাটা ছেড়ে ওপরের দিকে উঠতেই ওদের দু'জনের ছায়ামূর্তি দেখতে পেল যুবতী ও তরুণ। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে ওরা পোষাক না পরেই ছুটলো হাত ধরাধরি করে।

ওদের দিকে চোখ পড়তেই খোকার ক্ষুদ্র হৃদয়টি যেন লাফিয়ে চলে এলো গলার কাছে। আর একবারও আছাড় না খেয়ে সে তীরের মতন ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো যুবতীর বুকে।

যুবতী তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে, কপালে চুমু খেয়ে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে রে, খোকা? ভয় নেই, আর ভয় নেই।

খোকা কোনো কথা বলতে পারছে না, ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আগন্তুককে দেখতে পেয়ে তরুণ আবার ফিরে গিয়ে পাথরের চাঁইটার কাছ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এলো তার কুঠার। যুবতীকে বললো, তোমরা পিছনে হঠে যাও।

লোকটির থেকে কিছুটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে তরুণ গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে?

আগন্তুক পর্যায়ক্রমে একবার তরুণ ও একবার যুবতীকে দেখতে লাগলো বিস্ফারিত চোখে। তার ঠোঁট কাঁপছে।

তরুণ আবার জিজ্ঞেস করলো, তুমি কে? কিছু মনে আছে? তুমি কি ঐ জঙ্গল থেকে এসেছো?

আগন্তুক এবারে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো। তারপর অদ্ভুত করুণ আর্তনাদ বেরুতে লাগলো তার গলা থেকে। তার অতবড় শরীর, কিন্তু সে যেন একটা কীটের মতন অসহায়। বোধহয় তারও স্মৃতি নেই এবং নিজেকে প্রকাশ করারও ক্ষমতা নেই।

ঝড়ের বেগ অনেকটা কমে গেছে, আকাশে চমকাচ্ছে ঘন ঘন শব্দহীন বিদ্যুৎ। বৃষ্টির তেজ অবশ্য এক রকমই আছে।

আগন্তুকটিকে তরুণ কিছুক্ষণ কাঁদতে দিল। যুবতীর দিকে ফিরে বললো, এই আমাদের নতুন অতিথি।

যুবতী জিজ্ঞেস করলো, এই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে ও কোথা থেকে, কী করে এলো?

—তা আমি জানি না, আকাশ।

—ও আজ না এলেই পারতো। আমি তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ, আরও অনেকক্ষণ একলা থাকতে চেয়েছিলাম।

তরুণ যুবতীর মুখের দিকে চেয়ে হাসলো। তারপর একটা হাত বাড়িয়ে তার মাথার চুলে আদর করলো।

খোকা যুবতীর গায়ের সঙ্গে লেপ্টে আছে। তার পেটে সে অনবরত মুখ ঘষছে। এবারে মুখ তুলে বললো, ঐ লোকটা...ও আমাকে মারবে না?

যুবতী বললো, না। কিছু করবে না। আমরা তো আছি।

খোকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, আমি ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিলুম, ও তখন...ঐ লোকটা তখন আমাকে খেয়ে ফেলতে এসেছিল।

যুবতী বললো, না, না, খাবে কেন? ও তো আমাদেরই মতন মানুষ।

—ও তবে কথা বলে না কেন?

—তা জানি না। বোধহয় কথা বলতে পারে না।

—আরও এসেছে। সমুদ্রের ধারে আরও অনেক এসেছে।

—কী বললি?

উৎকণ্ঠায় যুবতীর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। আরও লোক এসেছে? এই ক'দিনেই এই দ্বীপটা যেন তাদের তিনজনের নিজস্ব হয়ে গেছে। এখানে আর কেউ আসবে, তা ওর পছন্দ হয় না।

সে তরুণকে ডেকে কথাটা জানালো।
তরুণেরও ভুরু কুঁচকে গেল দুশ্চিন্তায়। আরও অনেক লোক এসেছে। অথচ এখানে কোনো খাদ্য নেই।
সে এগিয়ে আগন্তুকের কাঁধে হাত দিয়ে বললো, তোমার সঙ্গে আরও অনেকে এসেছে? তোমরা কোথা থেকে এসেছো?
আগন্তুকটি একই রকম অদ্ভুত শব্দ করে যেতে লাগলো।
—তুমি কথা বলতে পারো না? তুমি কি আমাদের কথা বুঝতেও পারো না?
লোকটি মাটিতে মাথা ঠুকতে লাগলো এবার।
লোকটির শরীরের ওজন তরুণের প্রায় দ্বিগুণ, তবু তরুণ তাকে টেনে তোলবার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না। লোকটি আত্ম-নির্যাতন চায়।
যুবতীর দিকে ফিরে তরুণ বললো, তোমরা এখানে থাকো...কিংবা, ঝড় কমে গেছে, তোমরা ঘরে চলে যাও, আমি একটু এগিয়ে দেখছি—
যুবতী বললো, আমরাও তোমার সঙ্গে যাবো।
খোকা বললো, আমার ভয় করছে। ভীষণ ভয় করছে।
যুবতী বললো, চুপ! ভয়ের কথা বলতে নেই।
তরুণরা খানিকটা এগিয়ে যেতেই আগন্তুকটি বিলাপ থামিয়ে সেদিকে তাকালো। সে একা থাকতে চায় না। বাধ্য কুকুর যেমন প্রভুকে অনুসরণ করে, সেই রকম সেও চললো ওদের সঙ্গে।
বেলাভূমির ঢালু জায়গার সীমানায় পৌঁছেই ওরা দেখতে পেয়ে গেল। জলের ধারে কতকগুলো ছায়ামূর্তি হুটোপুটি করছে। যেন তারা কোনো একটা খেলায় মত্ত। অস্পষ্ট আলোয় এই দূরত্ব থেকে তাদের মানুষ বলেই মনে হয়।
তরুণের বুকটা দমে গেল। প্রথম দিন এসে সে মানুষের সান্নিধ্যের জন্য ব্যাকুল হয়েছিল। কিন্তু আজ এতগুলো মানুষের উপস্থিতি সে মেনে নিতে পারছে না।
যুবতী তরুণের কাঁধ ধরে অভিমান ভরা কণ্ঠে বললো, চলো, আমরা এখান থেকে-চলে যাই।
তরুণ বললো, কোথায়?
যুবতী বললো, আমরা আর এই দ্বীপে থাকবো না। আমরা অন্য কোথাও চলে যাবো। এক্ষুনি।
তরুণ বললো, কোথায় যাবো? কী করে যাবো?
যুবতী দু'দিকে ঘাড় নাড়তে নাড়তে ব্যাকুল ভাবে বললো, তা জানি না। আমরা যেমন ভাবে হোক এখান থেকে চলে যাবো। আমরা কিছুতেই ওদের সঙ্গে থাকবো না।
তরুণ বিষণ্ণ ভাবে হাসলো। মেয়েরাই পারে এমন চমৎকার ভাবে অবাস্তব কল্পনা করতে। কিন্তু সে পুরুষ, সে এই ভাবে সান্ত্বনা পেতে পারে না। তাদের সামনে এক নতুন সমস্যা এসেছে, যেমন করেই হোক এর মুখোমুখি হতেই হবে। এখান থেকে

পালাবার কোনো উপায় নেই।
সে আবার আগন্তুককে জিজ্ঞেস করলো, ওরা তোমার সঙ্গে এসেছে?
কোনো উত্তর না দিয়ে নির্বোধের মতন তাকিয়ে রইলো লোকটি। তারপর সেও সরে এসে তরুণের গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।
খোকা বললো, ওরা আমাদের খেয়ে ফেলবে। ওদের বড় বড় দাঁত।
তরুণ বললো, সবাই মিলে এক সঙ্গে গিয়ে লাভ নেই। তোমরা এখানে দাঁড়াও, আমি একটু এগিয়ে দেখছি।
তারপর যুবতীকে বললো, তুমি জামা আর প্যান্ট পরে নাও।
—আর তুমি?
—আমার এখন দরকার নেই।
তরুণ কয়েক পা এগিয়ে যেতেই আগন্তুকটি একবার যুবতী আর একবার তরুণের দিকে চাইলো। তারপর সে তরুণের সঙ্গে যাওয়াই মনস্থ করলো।
এবারে যুবতীর দেওয়া ছুরিটা খুলে হাতে নিয়ে তরুণ কঠোরভাবে তাকালো আগন্তুকের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, তোমরা যদি আমাদের মেরে ফেলতে চাও, তা হলে তোমাকে অন্তত আমি আগে শেষ করবো।
আরও খানিকটা এগিয়ে তরুণ বুঝতে পারলো, এতক্ষণ সে যাদের দেখছিল, তারা মানুষ নয়, অন্য কোনো প্রাণী। আকারে যদিও মানুষেরই সমান, কিংবা কিছুটা বড়।
সহজাত বুদ্ধি দিয়েই সে বুঝে গেল যে মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীকে তত ভয় পাবার নেই। অন্য প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করা যায়। সেই লড়াইতে জয়ের সম্ভাবনাই বেশী।
প্রাণীগুলো বুকে হাঁটছে, মাঝে মাঝে লাফিয়ে শূন্যে উঠছে। তরুণদের দিকে তারা ভ্রূক্ষেপও করছে না।
তরুণ যাদের দেখছে, তারা আসলে একদল ডলফিন। এরা স্বেচ্ছায় স্থলভূমিতে উঠে এসেছে। সমুদ্রে পরপর কয়েকদিন একটানা ঝড়ের সময় ডলফিনরা হঠাৎ গোষ্ঠিবদ্ধ ভাবে আত্মহত্যার নেশায় মেতে ওঠে। মানবেতর প্রাণীদের মধ্যে একমাত্র ডলফিন এবং তাদের স্বজাতি তিমি মাছরাই স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা ভাবে।
একটি ডলফিন তার দল ছেড়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে এসেছিল, তরুণ হঠাৎ গোঁয়ারের মতন ছুটে গেল তার দিকে। তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সে তার ছুরিটা বসিয়ে দিল ডলফিনটার মাথার ঠিক মাঝখানে।
ডলফিনটা কোনো রকম প্রতিরোধের চেষ্টা করলো না। শিশুর মতন সরল, ঝকঝকে, স্বচ্ছ চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো তরুণের দিকে। তারপর তার দৃষ্টি আস্তে আস্তে নিষ্প্রভ হয়ে এলো।
তরুণ পাগলের মতন উপর্যুপরি ছুরির আঘাত করে চললো ডলফিনটার ওপর। অন্য ডলফিনগুলোও আক্রমণ করতে এলো না তরুণকে। তারা লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে নেচে

তাদের মৃত্যুকে ডাকছে।

তরুণ নিহত ডলফিনটার গা থেকে কেটে নিল এক চাং মাংস। তারপর তাতে কামড় বসালো। এবার তাকে বমি করতে হলো না। সে ওপর দিকে খানিকটা ছুটে গিয়ে চ্যাঁচাতে লাগলো, খোকা! আকাশ! শিগগির চলে এসো!এখানে এসো, কোনো ভয় নেই!

ওরা যখন এসে পৌঁছোলো তখন তরুণ ডলফিনটার গা থেকে মাংস কাটতে ব্যস্ত। যুবতী জিজ্ঞেস করলো, এটা কী?

সাফল্যমাখা হাসি মুখে তরুণ বললো, তা জানি না। সমুদ্র আমাদের জন্য খাবার পাঠিয়েছে।

যুবতী তরুণের পিঠে ঠোঁট ঘষে আদর করে বললো, তুমিই তো সমুদ্র। তুমি আমাদের খাবার জোগাড় করে দিয়েছো। খোকা অন্য ডলফিনদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ওগুলো? ওরা তো বেঁচে আছে। ওরা আমাদের কামড়াবে না?

তরুণ বললো, না, ভয় নেই। এরা লড়াই করতে জানে না।

এক টুকরো মাংস কেটে সে খোকার হাতে দিয়ে বললো, আজ আগুন নেই, আজ কাঁচাই খেতে হবে। খেয়ে দ্যাখ, খারাপ লাগবে না।

প্রত্যেককেই এক টুকরো করে মাংস দেওয়া হলো। এতক্ষণ বাদে নতুন করে জ্বলে উঠেছে ওদের খিদের আগুন। নিঃশব্দে ওরা সেই রক্তমাখা কাঁচা মাংস চিবিয়ে চলল। আগন্তুকটি প্রথমে মাংসখণ্ড হাতে নিয়ে কী করবে বুঝতে পারেনি। একটু পরে অন্যদের দেখাদেখি খেতে শুরু করলো সে-ও।

বেশী খেতে পারলো না কেউই। খানিকটা রক্ত ও মাংসের নির্যাস তাদের পেটে গেল শুধু।

খাওয়া শেষ করার পর তরুণ ডলফিনটার পেটের কাছ থেকে অনেকখানি নরম মাংস কেটে নিল। সেটা আগন্তুকের হাতে দিয়ে বললো, এটা তুমি নিয়ে চলো। তোমাকেও কিছু কাজ করতে হবে।

লোকটি কিছুই না বুঝে তাকিয়ে রইলো ফ্যাল ফ্যাল করে।

তরুণ অন্যদের বললো, তোমরা একে নিয়ে ঘরে যাও। আমি আমার প্যান্টটা খুঁজে এনে যাচ্ছি।

যুবতী খোকাকে বললো, তুই ওকে নিয়ে যা তো। আমি একটু পরে আসছি।

খোকার মুখ শুকিয়ে গেল। সে এখনো আগন্তুককে ভয় পাচ্ছে। যুবতী তার গাল টিপে দিয়ে বললো, এত বড় ছেলে হয়েছিস, খালি ভয় পাস কেন? কিছু ভয় নেই। যাঃ!

তারপর সে আগন্তুকটির দিকে আঙুল দেখিয়ে, খোকার দিকে আঙুল দেখিয়ে ইশারার ভাষায় বোঝাবার চেষ্টা করলো। লোকটি বুঝলোও তাতে। সে খোকার সঙ্গে এগিয়ে গেল।

তরুণের হাত ধরে হাঁটতে হাঁটতে যুবতী এক সময় দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বললো, আর ক'দিন বাদে আমাদের সবারই প্যান্ট ছিঁড়ে যাবে। তখন তো আমাদের কিছু না পরেই থাকতে হবে।

তরুণ বললো, তখন আমি গাছের পাতা দিয়ে তোমার জন্য খুব সুন্দর পোশাক বানিয়ে দেবো।

যুবতী মহা উৎসাহের সঙ্গে বললো, দাও, তা হলে কালকেই একটা সেরকম পোশাক বানিয়ে দাও। আমি পাতার পোশাক পরবো। রোজ রোজ এই এক প্যান্ট জামা পরতে আমার একটুও ভালো লাগে না।

তরুণ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললো, দ্যাখো, বৃষ্টিও কমে আসছে।

—দ্যাখো, আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম বলেই তো! আমরা খাবার পেলাম, আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল।

তরুণ যুবতীর ঘাড়ের কাছে, কানের নিচে চুম্বন করলো।

যুবতী থমকে দাঁড়িয়ে বললো, সমুদ্র, আমার এখন কী ইচ্ছে করছে জানো?

—কী?

—আমি ছোট মেয়ের মতন মাটিতে পা ছড়িয়ে কাঁদি আর তুমি আমাকে আদর করে করে ভোলাবার চেষ্টা করো।

—তুমি হঠাৎ কাঁদবে কেন?

—আমার এত আনন্দ হচ্ছে···যে···মনে···হচ্ছে···খুব খানিকটা না কাঁদলে এত আনন্দ আমি সহ্য করতে পারবো না।

—কেন, এত আনন্দ হচ্ছে কেন?

—বেঁচে থাকার জন্য। এই যে আমরা বেঁচে আছি, তুমি আমার পাশে পাশে হাঁটছো, এর চেয়ে আনন্দের ব্যাপার আর কী হতে পারে?

তরুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে, আরও কয়েকটা দিন আমরা বেঁচে যাবো।

যুবতী বললো, ঝড় থেমে গেছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, আকাশ অন্ধকার হয়ে আসছে। ঐ দ্যাখো, তোমার সাধের কচ্ছপরা এরই মধ্যে কয়েকটা ওপরে উঠে এসেছে।

—আজ থাক। আজ ওদের আর ধরবো না। বরং ওদের এখন কয়েকদিন ডিম পাড়তে দেওয়া উচিত। ওরাই আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে।

যুবতী তরুণের দিকে বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি করে বললো, তুমি ভারি অদ্ভুত।

তারপরই সে সাঁ করে ছুটে গেল। বড় পাথরটার ধার থেকে তরুণের জবজবে ভিজে প্যান্টটা কুড়িয়ে নিয়ে বললো, দেবো না, এটা আমি তোমাকে দেবো না!

প্যান্টটা ধরে সে মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘোরাতে ঘোরাতে নাচতে লাগলো। উল্টো পাল্টা পদক্ষেপে উন্মাদিনীর মতন নাচ।

তরুণ সেদিকে তাকিয়ে হাসতে শুরু করলো অনাবিল ভাবে। এ পর্যন্ত সে একবারও

এরকমভাবে হাসেনি। তার মনে হলো, এই দ্বীপে আসবার পর থেকে, অর্থাৎ তার নতুন জন্মের পর আজকের এই মুহূর্তটাই সবচেয়ে সুন্দর।

ডলফিনের রক্ত-মাংস খেয়ে ওদের শরীরের শ্রান্তি দূর হয়ে গেছে অনেকটা।

একটু বাদে তরুণও ছুটে গিয়ে যুবতীকে আলিঙ্গনে বেঁধে ফেলে তার বুকের দু' দিকে মুখ রাখলো দু'বার।

তরুণের আলিঙ্গনে যুবতী যেন একটা বন্দী পাখির মতন ছটফট করতে লাগলো। কোনো ক্রমে সে নিজেকে ছড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল পাথরটার পেছনে। তারপর তরতর করে সেটার ওপরে উঠে গিয়ে সে বললো, এই যে আমি এখানে। সমুদ্র আমার ধরতে পারবে ?

তরুণ পাথরটার ঢালু দিকে চলে গিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগলো হামাগুড়ি দিয়ে।

যুবতী বললো, আমাকে ধরবে না কিন্তু। তা হলে আমি এদিক দিয়ে লাফ দিয়ে পড়বো।

তরুণ বললো, না, ওরকম করো না। তুমি বরং বাচ্চা মেয়ের মতন কাঁদো, আমি আদর করে তোমার মান ভাঙাবো।

—না, আমার আর এখন কাঁদতে ইচ্ছে করছে না।

—তা হলে হাসো, খুব জোরে জোরে হাসো।

যুবতী কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বললো, কেন, হাসবো কেন ? তুমি বললেই আমি হাসবো ?

তরুণ আস্তে আস্তে গড়ানে-পাথরটার ওপরে উঠছিল, এবারে সে খপ করে যুবতীর একটা পা ধরে ফেললো।

যুবতী বললো, এই, এই, আমায় টেনো না, আমি পড়ে যাবো। ছেড়ে দাও।

তরুণ বললো, না ছাড়বো না।

—একবার ছেড়ে দাও, তোমাকে একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি।

—কী ?

—একবার ছাড়োই না, দ্যাখো—

তরুণ যুবতীর পা ছেড়ে দিতেই সে অন্য পা তরুণের কপালে ঠেকিয়ে ঠেলে দিল খুব জোরে। তরুণ গড়াতে গড়াতে পড়ে গেল নিচে। যুবতী তার সমস্ত শরীরে ঝঙ্কার তুলে হাসতে লাগলো বালিকার মতন। যেন সে এখন একটা ঝরনা হয়ে গেছে। কিংবা এক ঝাঁক পাখি।

উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের বালি ঝাড়তে ঝাড়তে তরুণ বললো, এই তো তুমি এখন হাসছো।

যুবতীর হাসি আর থামেই না।

তরুণ মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখলো আকাশ ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

বৃষ্টি আর একেবারেই নেই। তাদের ঘরটা কী অবস্থায় আছে, কোনো দিকে ভেঙে পড়েছে কিনা সে এখনই ফিরে গিয়ে দেখতে চায়।

—চলো আকাশ, ঘরে চলো।

হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল যুবতী। তীক্ষ্ণ চোখে চাইলো তরুণের দিকে। তারপর বললো, তুমি এ রকম কেন ? আজ ঘুম ভাঙার পর মনে হয়েছিল আমরা আর বাঁচবো না। আজই ঝড়-বৃষ্টিতে শেষ হয়ে যাবো। কিন্তু এখন যে আমরা এত সুন্দরভাবে বেঁচে আছি। সে জন্য তোমার দারুণ দারুণ, ভীষণ ভীষণ, অসম্ভব অসম্ভব আনন্দ হচ্ছে না ? ইচ্ছে করছে না লাফাতে, মাটিতে গড়াগড়ি খেতে ?

তরুণ বললো, সত্যি আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে। বেঁচে থাকা, শুধু বেঁচে থাকাটাই খুব ভালো, কারণ বেঁচে না-থাকাটা যে কী তা তো জানি না ! তবে কি জানো, আকাশ, আমার যেন সব সময়ই মনে হয়, আমার কাঁধে খুব একটা দায়িত্ব, তোমার, খোকার, আজ আবার একটা লোক এসেছে, যে কথা বলতে পারে না···জানি না, এর পর আবার কে আসবে !

যুবতী ওর দিকে ভেংচি কেটে বললো, তুমি একটা ল্যাবা ! তুমি একটা···তুমি একটা···কী যেন !

নিজের জামার বোতামে হাত দিয়ে যুবতী বললো, আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে ইচ্ছে করছে, তোমায় গুম গুম করে কিল মারি। আমার আঙুলের নোখ দিয়ে তোমার পিঠ আর বুক ফালাফালা করে দিই, তোমার গাল কামড়ে রক্ত বার করি। বেঁচে থাকার জন্য আমার এত আনন্দ হচ্ছে যে আমার ইচ্ছে করছে···এক্ষুনি মরে যাই।

জামাটা খুলে তরুণের মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলো সে। তারপর প্যান্টটাও খুলে সেইভাবে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, তুমি আমায় পাতার পোশাক বানিয়ে দিও, এটা আর আমি পরবো না !

আলোহীন স্বচ্ছতার মধ্যে তরুণ দেখলো গোল পাথরটির চূড়ায় বসে আছে মূর্তিমতী পৃথিবী। ঐ যুবতীর শরীরেই রয়েছে অরণ্য, রয়েছে সমুদ্র, রয়েছে পাহাড়। ঐখানে রয়েছে নক্ষত্রপুঞ্জ। ঐখানে রয়েছে জীবন ও মৃত্যু। ঐখানে রয়েছে শাশ্বত ও নশ্বরতা।

কিংবা এসব কিছুই না। ঐখানে রয়েছে একটি নারী, যে একজন পুরুষকে ডাকছে।

একটু পিছিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে তরুণ দৌড়ে উঠে গেল পাথরটার ওপর। যুবতীও উঠে দাঁড়িয়েছে। তরুণ কাছে আসতেই যুবতী তাকে আবার একটা ঠেলা মারতে গেল কিন্তু তার আগেই তরুণ তার একটি হাত শক্ত করে ধরে ফেলেছে। ভারসাম্য সামলাতে না পেরে দু' জনেই গড়াতে গড়াতে পড়লো এসে নিচে।

তরুণের আগে যুবতীই নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। দৌড়ে সে পাথরটার আড়ালে চলে গিয়ে বললো, আমায় তুমি ধরতে পারবে না। কিছুতেই পারবে না।

তরুণ ছুটে ধরতে গেল তাকে। যুবতী পাথরটার চারদিকে ঘুরতে লাগলো। যেন

তারা দুটি শিশু। কিন্তু শৈশব তো চিরস্থায়ী হয় না। শৈশব এক সময়ে যৌবনে এসে পৌঁছোয়।

তরুণ খুব কাছাকাছি এসে পড়তেই যুবতী পাথরটা ছেড়ে চলে গেল খোলা জায়গায়। এবার তরুণ খুব সহজেই তাকে ধরে ফেললো। এরকম ভাবে ধরতে হবে বলেই প্রকৃতি পুরুষকে একটু বেশী গতিবেগ দিয়েছে বোধহয়।

তরুণ যুবতীর কপালে, ঠোঁটে, চিবুকে, গলায়, বুকে, কোমরে, উরুতে, নিতম্বে, পিঠে পুষ্প বৃষ্টির মতন চুম্বন দিতে লাগলো।

যুবতী বললো, আমরা আর কিছুতেই মরবো না।

তরুণ বললো, তুমি আমায় মারলে না ? রক্ত বার করে দিলে না ? নোখ দিয়ে চিড়ে দেবে বলেছিলে—

যুবতী বললো, এসো আমরা একটু নাচি। তুমি নাচবে আমার সঙ্গে।

কী করে নাচতে হয় আমি তো জানি না।

তুমি আমার হাত ধরো, তারপর দুলতে থাকো। মনে করো, তুমি সমুদ্রের একটা ঢেউয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছো, ঢেউ তোমায় দোলাচ্ছে, তুমি একবার আকাশে উঠে যাচ্ছো, একবার জলের নিচে। আকাশেও নীল নীল অন্ধকার, আর জলের মধ্যেও নীল নীল অন্ধকার। তোমার আর একটা হাত আমার বুকে রাখো, আমিও তোমার বুক ছুঁয়ে থাকি, যেন আমরা হারিয়ে না যাই, আমরা আর দূরে সরে না যাই···

পাতলা মেঘ চিড়ে ফুটছে একটু একটু আলো। যেন এইমাত্র জন্ম নিচ্ছে একটা নতুন চাঁদ। সেই নতুন চাঁদের পরীক্ষামূলক জ্যোতি প্রথম এসে পড়ছে এই এক জোড়া মানব-মানবীর ওপরে। আকাশে এখন তৈরি হচ্ছে পাহাড়-জঙ্গল-সমুদ্র, অচেনা ভূমির মানচিত্র। আর নিচের সমুদ্র শান্ত, তার ঢেউতে এখন তাণ্ডব নেই, গর্জন নেই, যেন পর পর ঢেউপাতের শব্দ শোনাচ্ছে সঙ্গীতের মতন।

বাতাসের তরঙ্গের মতন ওরা দু' জনে নাচছে। নাচ প্রথমে শুরু হয় এক রকম ভাবে। তারপর শরীর যতই দুলতে থাকে ততই উৎপন্ন হয় নেশা, রক্ত স্রোত একটু একটু করে সেই নেশা টের পায়, ক্রমে রক্তও নাচে, নিজের ঘোরে নিজেই মেতে ওঠে।

এইভাবে ওরা পরস্পরের মধ্যে মিশে গিয়ে হারিয়ে গেল।

বেশ কিছুক্ষণ পর ওরা কাঁধ ধরাধরি করে ফিরতে লাগলো ঘরের দিকে। এক একবার এ ওর ওষ্ঠ চুম্বন করছে, আর অস্ফুটে অর্থহীন কথা বলে যাচ্ছে। এখন পোশাক পরে নিয়েছে ওরা।

খানিকটা যাবার পর তরুণ বললো, চলো একটু সমুদ্রের ধারটা দেখে যাই। সেই জন্তুগুলোর কী হলো—

যুবতীও উৎসাহের সঙ্গে বললো, চলো—।

যেন এক মুহূর্তেরও বিচ্ছেদ সইবে না, এ জন্য ওরা দৌড়োবার সময়ও পরস্পরের হাত ছাড়ছে না। মাঝে মাঝেই একজন আর একজনের মুখের দিকে তাকাচ্ছে, তখন

পলক পড়ে না।

এদিকে ওদিকে এলোমেলোভাবে মাটিতে পড়ে আছে প্রায় চোদ্দ-পনেরোটা ডলফিন। একটু দূর থেকে জ্যোৎস্নার আলোতে ওদের এখন ঠিক শুয়ে থাকা মানুষের মতনই দেখায়। প্রায় সবগুলোই নিস্পন্দ হয়ে এসেছে।

কেন ডলফিনগুলো মরবার জন্য স্থলভূমিতে উঠে এসেছে, তা ওরা বুঝতে পারলো না। একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকবার পর তরুণ বললো, এ তো আমাদের অনেক দিনের খাবার।

যুবতী বললো, তোমায় আর জঙ্গলে যেতে হবে না। হাঁসও মারতে হবে না। এখন তোমায় আমি নাচ শেখাবো, তুমি আমায় সাঁতার শেখাবে।

যুবতীর নাকটা ধরে নেড়ে দিয়ে তরুণ বললো, তোমাকেও আর কচ্ছপের মাংস খেয়ে বমিও করতে হবে না। এর মাংস তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?

তরুণের হাতটা ধরে একটা আঙুল কামড়ে দিল যুবতী। তারপর বললো, যদি পছন্দ না হতো, তা হলে আমি তোমার মাংস খেতুম। এই শোনো, কালকে কিন্তু আগুন জ্বেলো। কাঁচা মাংস খেতে আমার ভালো লাগে না।

তরুণ বললো, আগুন তো জ্বালতেই হবে। কিন্তু এত বৃষ্টি হলো, শুকনো পাতা তো পাওয়া যাবে না। কাল যদি ভালো করে রোদ্দুর ওঠে—

—কাল আমি তোমার জন্য ঠিক রোদ্দুর এনে দেবো। খুব ভালো রোদ্দুর।

তরুণ ঠিকই সন্দেহ করেছিল, তাদের ঘরের চালের একটা অংশ ভেঙে গেছে। সেইখান থেকে জ্যোৎস্নার আলো এসে পড়েছে ঘরে। তাতে দেখা গেল, খোকা নিথর হয়ে শুয়ে আছে, সম্ভবত ঘুমিয়ে পড়েছে। আগন্তুকটি এক কোণে বসে আছে চুপ করে, তার মুখ নড়ছে, ঠিক গরুদের জাবর কাটার মতন। কিংবা মনে হয় সে তার জিভ চুষছে। তার ভয়ানক চেহারার জন্য তার এই ভঙ্গিটিকে মনে হয় কোনো উন্মুখ নর-খাদকের মতন।

ঘরের মধ্যে ঢুকে তরুণ বললো, এই ঘরে চার জন শোওয়া অসম্ভব। তিন জনেই খুব ঘেঁষাঘেঁষি হচ্ছিল।

যুবতী বললো, আমি বাবা খোকার পাশে শুয়ে পড়ছি। তুমি ঐ বোবাটাকে যা বোঝাবার বোঝাও।

তরুণ বললো, যতদূর মনে হচ্ছে আজ রাত্তিরে আর বৃষ্টি হবে না। আজ আমি বাইরে শুতে পারি।

যুবতী বললো, তা হলে আমিও তোমার সঙ্গে বাইরে শোবো। আমি এই ভাল্লুকটার সঙ্গে এক ঘরে থাকতে পারবো না।

খোকাও আসলে ঘুমোয়নি, এতক্ষণ মটকা মেরে শুয়ে ছিল, এবার সে ধড়ফড় করে উঠে বসে বললো, আমিও তোমাদের সঙ্গে বাইরে শোবো।

তরুণ বললো, কিন্তু কুকুর ? যদি কুকুর আসে ? ঝড়-বৃষ্টির জন্য ওরাও তো এই

ক'দিন বাইরে আসতে পারেনি। আজকে আসার খুবই সম্ভাবনা।

যুবতী বললো, কুকুর তো ঘরেও আসতে পারে, যদি সবাই ঘুমিয়ে পড়ি…আজ আর আগুনও নেই।

তরুণ বললো, তোমরা ঘরেই থাকো। আমি বাইরে বসে পাহারা দেবো। ঘুমোবো না। সকালে ঘুমোবো।

যুবতী এগিয়ে এসে তরুণের বুকে হাত রাখলো, মিনতি পূর্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললো, একটা কথা বলবো ? তুমি রাখবে বলো ? আমি খোকার সঙ্গে একটু ঘুমোবো। তারপর তুমি আমায় ডেকে দেবে। তখন তুমি ঘুমোবে, আমি পাহারা দেবো। কুকুর এসে পড়লে তোমায় তো ডাকতেই হবে। আমি আদ্ধেক রাত্তির পাহারা দিতে চাই।

তরুণ বললো, আচ্ছা।

আগন্তুকটি মুখনাড়া বন্ধ করে একরোখা দৃষ্টিতে ওদের দেখছিল। তরুণ ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে বসতেই সে-ও বেরিয়ে এসে একটু দূরে তরুণের মুখোমুখি বসলো।

বাইরের বালি খুবই ভিজে। এখানে শোওয়া শক্ত ব্যাপার। অবশ্য ঘরের মধ্যে তাদের পত্রশয্যাও ভিজে নেতিয়ে আছে।

আজ দিনের একটা অংশ নানা রকম উত্তেজনার মধ্যে কাটলেও তরুণের শরীর বেশ অসুস্থ। তার পায়ের ঘা-তে আজ বেশ কয়েকবার আঘাত লেগেছে। তার সারা দেহে একটা জ্বর জ্বর ভাব। তা ছাড়া তার শরীর থেকে অনেক ঘাম ঝরেছে বলে এখন ঘুমে তার চোখ টেনে আসছে। তবু সে জেগে থাকবার জন্য বদ্ধপরিকর।

সে এবার আগন্তুককে ভালো করে দেখলো।

লোকটিকে দেখলে পশুর কথা মনে পড়ে, কারণ এর সারা দেহ অত্যন্ত লোমশ। তার বুকে তো একটি জঙ্গল, পিঠেও ছোপ ছোপ লোম, সেই রকমই বাহুতে। এই ক'দিনে তরুণেরও মুখে অল্প অল্প দাড়ি গজিয়েছে কিন্তু এই লোকটির মুখে অনেক দিনের দাড়ি। লোকটির মাথায় চুলও অনেক, কিন্তু তার মাথার বাঁ দিকে ঘাড়ের দিকে অনেকখানি জায়গায় চুল নেই একেবারে। ওর কপালের দিক থেকে বাঁ দিকের ঘাড় পর্যন্ত বিশ্রী পোড়া দাগ। ওর চোখ দুটি ভাবলেশহীন, সম্পূর্ণ নির্বোধের মতন। কিন্তু সরল নয়। তার চোখের পলক সহজে পড়ে না বলে তাকে খুব নিষ্ঠুর মনে হয়।

তবু লোকটির সম্পর্কে মায়া হলো তরুণের। কুকুর কিংবা হাঁসেরও একটা নিজস্ব ডাক আছে, তারা নিজেদের ভাষায় কথা বলে, কিন্তু এ মানুষ, এর কোনো ভাষা নেই।

তরুণ মাটিতে চাপড় মেরে ওকে ইঙ্গিত করলো শুয়ে পড়তে। কিন্তু আগন্তুকটি হয় সে ইঙ্গিত বুঝলো না অথবা সে এখন শুতে চায় না। সে মনোযোগ দিয়ে দেখছে তরুণের কোমরের ছুরিটা। তরুণ সেটা লক্ষ করলো।

লোকটার কি ছুরিটার ওপর লোভ হয়েছে ? কেন ? তরুণ ভাবলো, সে যখন ঘুমিয়ে

থাকবে, সেই সময় লোকটি যদি তার গলা টিপে ধরে, তা হলে তার বাঁচবার আর কোনো আশাই থাকবে না। এই লোকটির শারীরিক শক্তির কাছে তরুণ প্রায় একটি বালক। কিন্তু এই লোকটি তরুণকে মারতে চাইবে কেন ?

কথা শুনলে মানুষকে অনেকটা চেনা যায়। এর মুখের কথা নেই বলেই এর হৃদয় দুর্বোধ্য।

এই সময় আগন্তুক একটা উৎকট শব্দ করলো।

তরুণ জিজ্ঞেস করলো, কী ?

আগন্তুক সেই একই শব্দ করলো আবার।

অসম্ভব ব্যাপার, এর মনের কথা তো বোঝাই যাবে না, বরং এই রকম শব্দ সহ্য করাই শক্ত। তরুণ ঠোঁটে হাত দিল। তাতেও সে থামে না। তরুণ কান চাপা দিল।

যুবতী বাইরে বেরিয়ে এসে বললো, কী হয়েছে ?

তরুণ বললো, কী জানি ও কী বলতে চায়। কিংবা ওর বোধহয় কোনো কষ্ট হচ্ছে। তুমি ভেতরে যাও।

—এই রকম চ্যাঁচালে ঘুমোবো কী করে ?

—আমি তোমায় ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি। খোকার সেই জিনিসটা নিয়ে এসো তো, যে জিনিসটা দিয়ে শব্দ বেরোয় !

যুবতী ভেতরে ফিরে গিয়ে খুঁজে নিয়ে এলো মাউথ অর্গানটা। তরুণ সেটায় ফুঁ দিতেই আগন্তুক থেমে গেল। গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে একটুক্ষণ শুনলো বাজনাটা। তারপর হাত বাড়িয়ে সেটা কেড়ে নিতে গেল।

তরুণ প্রথমে রূঢ়ভাবে লোকটির হাত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললো, নাঃ !

পর মুহূর্তেই সে মত বদলে ফেলে মাউথ অর্গানটা লোকটির হাতে তুলে দিয়ে বললো, নাও। দেখি বাজাও তো !

লোকটি তরুণের অনুকরণে ফুঁ দিল। কিন্তু এ যেন কোনো ওরাং-ওটাং-এর মানুষকে অনুকরণ। সে ঠিক মতন ফুঁ দিতেই জানে না।

তরুণ আবার হাতটা বাড়িয়ে অনুনয়ের সুরে বললো, দাও, আমাকে দাও।

বিনা আপত্তিতে আগন্তুক এবার ফিরিয়ে দিল সেটা। তরুণ এবারে সুর তুললো চোখ বুজে। সামান্য শব্দই হয়ে উঠলো ব্যঞ্জনাময়। এটা বাজাতে তরুণ খুব ভালোবাসে। বাজাবার সময় সে আর সব কিছু ভুলে যায়। সে বালির ওপর বসে বাজাচ্ছে, কিন্তু তার শরীরটা যেন নাচছে।

যুবতী তরুণের পিঠ ঘেঁষে বসে শুনতে লাগলো বাজনা। এক সময় ঘুমে ঢলে এলো তার চোখ। তরুণ আস্তে আস্তে শুইয়ে দিল তাকে। আগন্তুকটিও শুয়ে পড়েছে নিজের জায়গায়, সে আর কোনো শব্দ করছে না। সে-ও যেন সুর ও অ-সুরের তফাৎ বোঝে। তরুণ তখনো বাজিয়েই চললো।

তারপর কখন সে শুয়ে পড়েছে, সে নিজেই জানে না।

॥ ১০ ॥

যথারীতি খোকাই জেগেছে সকলের আগে। ঝড়-বৃষ্টি নেই দেখে সাহস করে সে সমুদ্রের কাছাকাছি ঘুরে আসতেও গিয়েছিল, ছুটে ফিরে এসে সে তরুণকে জাগাবার জন্য ধাক্কা দিতে লাগলো।

তরুণ চোখ মেলতেই সে বললো, কুকুর!

পৃথিবীর আর যে-কোনো নাম শুনলে তরুণের জড়তা ভাঙতে দেরি লাগতো, কিন্তু ঐ শব্দটা শোনা মাত্র সে স্প্রিং-এর মতন লাফিয়ে উঠলো। দ্রুত চোখ বুলিয়ে সে তার কুঠারটা খুঁজতে খুঁজতে বললো, কই? কোন্ দিকে?

—সমুদ্রের ধারে।

—তুই একলা একলা গিয়েছিলি কেন? তোকে দেখতে পায় নি?

—না, দেখেনি। ওরা খাচ্ছে। সেই জিনিসগুলোকে খেয়ে ফেলছে।

আগন্তুক চিৎ হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে নাক ডাকছে বেশ জোরে জোরে। বেশ খানিকটা দূরে যুবতী শুয়ে আছে বাঁ পাশ ফিরে, হাত দুটো বুকের কাছে জড়ো করা। আকাশ পরিষ্কার, সূর্য এখনো দেখা না গেলেও কাঁচা জামরুল রঙের আলো ছড়িয়ে পড়েছে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে।

যুবতী আর আগন্তুককে ডেকে তুললো তরুণ। কুকুরগুলো যদি হঠাৎ এদিকে এসে পড়ে সে জন্য তৈরি থাকা দরকার। আর কয়েকটা কুড়ুল বানাতে হবে।

যুবতীর ভালো করে ঘুমের ঘোর কাটেনি। অর্ধ প্রস্ফুটিত মুখ তুলে সে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে?

তরুণ ঘর থেকে একটা লাঠি এনে বললো, এটা ধরো। লড়াই করতে হবে, কুকুর আসছে।

একটা বড় পাথরের টুকরো তুলে সেটা আগন্তুকের হাতে দিয়ে বললো, তুমি এটা রাখো।

খোকা বললো, আমায় কিছু দিলে না? আমায় ছুরিটা দাও।

তরুণ বেল্ট সমেত ছুরিটা তাকে দিয়ে বললো, তুই একদম পেছনে থাকবি। ছুরি দিয়ে কুকুরের পালের সঙ্গে লড়াই করা যায় না।

সে আগে আগে এগিয়ে গেল বেলাভূমির দিকে। একটু দূরত্বে বাকি তিন জন। আগন্তুক দু' হাত দিয়ে পাথরটা এমন ভাবে ধরে আছে যেন তাকে কেউ একটা লাউ বা কুমড়ো বইতে দিয়েছে।

আজ কুকুরের সংখ্যা অন্তত কুড়ি বাইশটা। তারা মহা উল্লাসে মৃত ডলফিনগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে তাদের গলা দিয়ে এক রকম শব্দ বেরুচ্ছে, কিন্তু তা মোটেই হিংস্র নয়।

কুকুর অতি সতর্ক প্রাণী। তরুণরা দৃষ্টিসীমায় আসতেই তারা ঘাড় ফিরিয়ে একবার দেখে নিল। কিন্তু গ্রাহ্য করলো না। আবার মন দিল খাওয়াতে।

তরুণ ওদের আরও কাছে চলে গেল। তবু কুকুরের পাল ওদের আক্রমণ করার কোনো উৎসাহই দেখালো না। তারা খাওয়াতেই ব্যস্ত। এই চার পাঁচ দিন ওদেরও নিশ্চয়ই আহার জোটেনি।

তরুণ বললো, এখন আর ওরা আমাদের কিছু বলবে না। খাবারের জন্যই শত্রুতা হয়।

খোকা বললো, কিন্তু ওরা আমাদের খাবার খেয়ে নিচ্ছে। আমরা ওদের তাড়িয়ে দেবো না?

তরুণ বললো, খাক না, কত খাবে! অত মাংস তো আমরা খেতে পারবো না।

যুবতী বললো, তিন চার দিন বাদে তো এমনিতেই পচে যাবে।

খোকা বললো, আমার খিদে পেয়েছে।

তরুণ বললো, তুই ঘরে চলে যা। কালকের মাংস আছে, তার থেকে খানিকটা খেয়ে নে।

যুবতী জিজ্ঞেস করলো, তুমি আগুন জ্বালবে না?

—জ্বালবো। খোকা, তুই ঘরে গিয়ে ভিজে পাতাগুলো বাইরে এনে রাখ তো। রোদ উঠলে শুকিয়ে যাবে।

—আমি একলা যাবো না। সবাইকে যেতে হবে।

—তা হলে একটু দাঁড়া, ওদের ব্যাপারটা দেখেনি।

একটু দূরে বালির ওপর ওরা বসলো। আগন্তুক কিন্তু দাঁড়িয়েই রইলো এক জায়গায়। আবার তার মুখ নড়ছে, যেন সে আবার নিজের জিভ চুষতে শুরু করেছে। সে একদৃষ্টে দেখছে নতুন-ওঠা রক্তিম সূর্যের দিকে। তারপর পাথরটা একই রকম ভাবে ধরে থেকে এগিয়ে যেতে লাগলো কুকুরগুলোর দিকে।

তরুণ লাফিয়ে উঠে ওর ঘাড় ধরে আটকে বললো, এই এই, তুমি যাচ্ছো কোথায়?

আগন্তুক ঘাড় ফিরিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করলো।

তরুণ দু' দিকে মাথা নেড়ে কুকুরগুলোর দিকে আঙুল তুলে ইঙ্গিতে বোঝাবার চেষ্টা করলো যে ওদিকে যেতে নেই।

যুবতী আর খোকা লোকটির রকম-সকম দেখে হাসছে। যুবতী বললো, ওকে আটকালে কেন, ও যাক না। ও বোধহয় জানেই না বনের কুকুর মানে কী! একবার গেলেই বুঝতো।

তরুণ বললো, আহা বেচারা, ও কিছু বোঝে না।

যুবতী বললো, সমুদ্র, তুমি ওকে অত আদর করো না। ওকে আমার বিশ্বাস হয় না। দেখলেই ভয় হয়।

খোকা বললো, আমারও ভয় হয়।

তারপরই সে যুবতীর দিকে বিস্মিত মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই তুমি ওকে সমুদ্র বলে ডাকলে কেন ?

—কেন ডাকলে কী হয়েছে ?

—তুমি ওর নাম দিয়েছো ?

—হ্যাঁ ।

—তা হলে আমার নাম দাও । আমার কেন নাম থাকবে না ?

—তোর নাম খোকা, এই তো বেশ ভালো নাম ।

—না, আমারও নাম চাই তোমাদের মতন ।

—তা হলে তোমার নাম হোক বৃষ্টি । তুই যেমন দুষ্টু, এখানকার বৃষ্টির মতন ।

—কিন্তু ও যে বলেছিল সমুদ্র আর বৃষ্টি নাম হয় না । তা হলে আসল সমুদ্র আর বৃষ্টিকে আমরা কী নাম ধরে ডাকবো ।

—সে ঠিক বোঝা যাবে । বৃষ্টি নামটা তোর পছন্দ হয়েছে কি না বল্ । না হলে তোর নাম হাওয়া-ও দিতে পারি ।

—না, বৃষ্টিই ভালো । তা হলে ঐ লোকটা, ওর নাম কী হবে ?

—ওর নাম দরকার নেই । ও তো কথাও বলতে পারে না । কিছু বুঝতেও পারে না ।

—তা হলেও ওর একটা নাম দরকার । ওকে আমরা সেই নামে ডাকবো । আমি ওর নাম দেবো ? ওর নাম, ওর নাম দিলুম জঙ্গল । দ্যাখো না, মুখে কী রকম জঙ্গলের মতন দাড়ি ।

তরুণ বললো, বাঃ, খোকা তো বেশ নাম দিতে পারে ।

—খোকা বলবে না, আমি এখন বড় হয়ে গেছি, আমার নাম বৃষ্টি ।

তারপর সে আগন্তুকের দিকে ফিরে ডাকলো, এই জঙ্গল, জঙ্গল ! হি-হি-হি ... ও বুঝতেই পারছে না যে আমি ওকে ডাকছি । হি-হি-হি ।

তরুণ একটু ভর্ৎসনা-চোখে তাকালো খোকার দিকে ।

কুকুরের দল পেট ভরে খেয়ে তারপর একটা ডলফিনকে সবাই মিলে টানতে টানতে নিয়ে গেল জঙ্গলের দিকে ।

তরুণ দেখতে চাইলো ওরা একটাকে জঙ্গলে রেখে আবার আর একটাকে এসে নিয়ে যায় কি না । কিন্তু কুকুরগুলো আর ফিরে এলো না ।

খোকা সমুদ্রের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, দ্যাখো, দ্যাখো !

আকাশে আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে একটা রামধনু । ক্রমশ সেটি স্পষ্ট হলো । তার এক দিক জলের মধ্যে, অন্য দিকটি চলে এলো জঙ্গলের মাথায় । অপরূপ মহিমার মত সেই রামধনু সাজিয়ে দিল আকাশকে ।

খোকা জিজ্ঞেস করলো, ওটা কী ?

ওদের কারুরই রামধনু সম্পর্কে কোনো পূর্ব স্মৃতি নেই । কেউ কোনো উত্তর দিল না, মুগ্ধ বিস্ময়ে ওদের মুখ আলোকিত হয়ে রইলো । আগন্তুকও একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সেদিকে, তার মুখের মধ্যে জিভ নড়া বন্ধ হয়ে গেছে ।

কয়েকটি সিন্ধু সারস জল থেকে উঠে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে গেল যেন রামধনুর মধ্যে মিশে যেতে ।

যেমন হঠাৎ উঠেছিল, তেমন হঠাৎই আবার একটু পরে অদৃশ্য হয়ে গেল রামধনু ।

খোকা আবার জিজ্ঞেস করলো, কোথায় চলে গেল ?

যুবতী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, এসব কোথা থেকে আসে, কোথায় চলে যায় আমি কিছুই জানি না ।

তরুণ উঠে দাঁড়িয়ে বললো, চল খোকা, তোর খিদে পেয়েছে বলছিলি না !

—আবার খোকা বলছো ? আমাকে বৃষ্টি বলবে ।

—আমার এখন বৃষ্টির নাম করতে ইচ্ছে করছে না, যা বৃষ্টি গেছে এই ক'দিন, আর বৃষ্টি চাই না !

ঘরে ফিরে এসে যুবতী বললো, ঐ কুকুরগুলোর মতন আমি কাঁচা মাংস খেতে পারবো না । আকাশ, তুমি আগুন জ্বেলে দাও !

—শুকনো পাতা না পেলে তো আগুন জ্বালা যাবে না । কাঠের গুঁড়িটাও ভেজা । এগুলো সব বাইরে বার করে দিতে হবে ।

সবাই মিলে ধরাধরি করে ঘরের সব জিনিসপত্র বার করে দিল । সোনার মতন উজ্জ্বল রোদ উঠেছে এখন । অনেক জায়গার বালি শুকিয়ে গেছে এরই মধ্যে । ছোট ছোট কীট পতঙ্গেরা ফিরে আসছে ।

তরুণ চার টুকরো মাংস চার জনকে দিল । যুবতীকে বললো, খিদে পেলে এখন একটু কাঁচাই খাও কষ্ট করে । বিকেলের মধ্যেই আমি আগুন জ্বেলে দেবো ।

যুবতী বললো, আমার খিদে পায় নি ।

বাকি তিনজন কাঁচা মাংসই চিবোলো খানিকক্ষণ । তারপর তরুণ উঠে গেল ঘর মেরামত করতে ।

আগন্তুক তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো । ঘরের চালটা পুরোই খুলে ফেললো তরুণ, গাছের ডালগুলো আলাদা করে সেগুলো ধরতে দিল আগন্তুককে । তরুণ তাকে বললো, এবারে আরও মজবুত করতে হবে, বুঝলে ? ঘরটাকেও আরও বড় করতে হবে ।

আগন্তুক তার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলো সাদা ভাবে । তার জিভ ঘন ঘন নড়ছে ।

তরুণ যুবতীকে বললো, আমাকে একবার জঙ্গলের ধারে যেতে হবে । অনেক লতা আনা দরকার ।

যুবতী বললো, চলো, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি । কুকুররা পেট ভরে খেয়েছে, ওরা এখন কিছু বলবে না ।

খোকা বললো, আমিও যাবো ।

আগন্তুকও নিঃশব্দে অনুসরণ করতে লাগলো ওদের।

যুবতী খানিকটা হতাশা ও বেদনা মাখা দৃষ্টিতে তাকালো তরুণের দিকে। তরুণ অবশ্য সে রকম দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল না। সে নির্বিকার।

এবারে জঙ্গলের কিনারায় কিনারায় খোঁজাখুঁজি করে ওরা জোগাড় করলো বেশ ভালো জাতের শক্ত লতা। অনেক রকম পাথর খুঁজে খুঁজে কয়েকটা ধারালো পাথর বেছে নিল তরুণ। কয়েকটা গাছের ডাল কেটে নিয়ে প্রত্যেকের জন্য একটা করে কুড়ুল তৈরি করে দিল তরুণ।

নিজের কুড়ুলটা পেয়ে আগন্তুক ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করতে লাগলো, জিভ দিয়ে এখন ঠোঁট চাটছে। তার পোড়া দাগওয়ালা মুখখানা এই সময় দেখতে বীভৎস লাগে। তবে এটাই বোধহয় তার আনন্দ প্রকাশের উপায়।

খোকা বললো, এই জঙ্গলকে জঙ্গলেই পাঠিয়ে দাও না! দ্যাখো কী রকম করছে!

যুবতীও শিউরে উঠে তরুণের বাহু ধরে ফিসফিস করে বললো, দেখে মনে হচ্ছে, যেন আমাদের কামড়ে দেবে!

তরুণ বললো, না, না, ও খুব শান্ত। জঙ্গল, শোনো-তোমার কুড়ুলটা এই ভাবে ধরে, এই গাছের ডালটা কাটো।

আগন্তুক তরুণের অনুকরণ করলেও দেখা গেল যে মানুষটি অত শক্তিশালী হলেও সে কুড়ুল চালাতে জানে না। আলগা করে কুড়ুলটা ফেলছে আর সেটা পিছলে যাচ্ছে।

তরুণ অসীম ধৈর্য নিয়ে তাকে শেখাতে লাগলো। কিন্তু লোকটি ছাত্র হিসেবে বেশ খারাপ। অদ্ভুত নির্বোধের মুখ করে তরুণের দিকে তাকায়, তারপর একই ভুল করে।

প্রত্যেকেই কাঁধে করে এক বোঝা ডালপালা নিয়ে ফিরে এলো নিজেদের জায়গায়। তারপর সারা দিন ধরে তরুণ ব্যস্ত রইলো ঘর বাঁধার কাজে। এবার সে আরও একটু নিচু করে পেছনের পাথরগুলোর সমান মাপে বসালো ঘরটা। আবার ঝড় এলে যাতে পুরো ঝাপটা ঐ পাথরের ওপর দিয়েই যায়। অবশ্য ঝড়ের গতি যদি উল্টো দিক থেকে হয় তাহলে কিছুই করার নেই।

খোকা ছাড়া ওরা আর কেউ সেই ঘরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। তবু যুবতী বললো, বাঃ, বেশ হয়েছে। আকাশ, তুমি যে বলেছিলে, পাতা দিয়ে আমার জন্য পোষাক তৈরি করে দেবে। এবার সেটা বানিয়ে দাও!

তরুণ বললো, দেবো, কিন্তু এখন নয়। এখন আমি স্নান করবো, অনেকদিন সমুদ্রে নামি নি।

—আমিও সমুদ্রে নামবো তোমার সঙ্গে। তুমি বলেছিলে আমায় সাঁতার শিখিয়ে দেবে!

খোকা বললো, আমাকেও সাঁতার শিখিয়ে দাও!

আগন্তুক মুখে কিছু বলতে না পারলেও সেও ওদের পেছনে এসে নেমে পড়লো জলে।

বিকেল গড়িয়ে এসেছে সন্ধের কাছে। সারাদিন আজ বৃষ্টি হয়নি, সমুদ্রও খুব শান্ত। তীরের কাছাকাছি সবুজাভ জলে অসংখ্য হীরের কুচি। ঢেউগুলি নরম ভাবে এসে গায়ে ভাঙছে।

খোকা জলের প্রান্তে এসে তারপর আর নামতে ভয় পেয়েছে। যুবতীর হাত ধরে তরুণ এগিয়ে গেল গভীরতার দিকে। যুবতী ভয় পেয়ে ছোট করে ফেলছে শরীরটা, তরুণকে শক্ত করে চেপে ধরে বলছে, আর না না ...।

তরুণ বললো, যতক্ষণ আমাকে ধরে থাকবে, ততক্ষণ কোনো ভয় নেই।

ঢেউ-এর এলাকা পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত শান্ত এলাকায় না গেলে সাঁতার কাটা যাবে না, তাই তরুণ এগোচ্ছে সেইদিকে। সেখানে তার গলা জল, যুবতী সেখানে ডুবে যাবে বলে তরুণ ওর তলপেটের তলায় হাত দিয়ে ওকে ভাসিয়ে রেখেছে। দু'একটা বড় ঢেউ এলে ডুব দিচ্ছে এক সঙ্গে।

আগন্তুক বড় ঢেউ দেখে ডুবও দিচ্ছে না, লাফাচ্ছেও না, ধাক্কা খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। আবার উঠে সে দাপিয়ে দাপিয়ে এগিয়ে আসছে সোজা। ক্রমে সে তরুণের গা ঘেঁষে চলতে লাগলো।

যুবতী বললো, কী মুশকিল, এই ভাল্লুকটা কি আমাদের একটুও একা থাকতে দেবে না?

তরুণ বললো, এ সাঁতার জানে কি না কে জানে! আমি তো দু'জনকে সামলাতে পারবো না।

তরুণ তাকে আঙুলের ইঙ্গিতে বোঝালো তীরের দিকে চলে যেতে। কিন্তু সে যাবে না। তরুণ তাকে কিছু বলতে গেলেই সে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে।

তরুণ তখন যুবতীকে সাঁতার শেখাবার ব্যাপারে মন দিল। এক হাতে যুবতীর তলপেট ধরে থেকে সে অন্য হাতে ওর হাত পা ছোঁড়া ঠিক করে দিতে লাগলো। যুবতী মুখ দিয়ে নানা রকম শব্দ করছে আর প্রবল উৎসাহে জল মাতাচ্ছে। এক একবার তরুণ তার পেট থেকে হাত সরিয়ে নিতেই সে চিৎকার করছে প্রাণ ভয়ে। আর তরুণ হাসছে।

এরই মধ্যে আগন্তুক হঠাৎ এসে যুবতীকে ঠেলে ফেলে দিল। যুবতী খানিকটা ডুবে গিয়ে নাকানি-চোবানি খেতে খেতেই তরুণ আবার তুলে নিল তাকে। তারপর সে আগন্তুকের দিকে তাকালো। সে আবার যুবতীকে ঠেলে ফেলবার জন্য হাত বাড়িয়েছে।

তরুণ একটু সরে গেল। যুবতীকে তার পিঠের ওপরে নিয়ে গিয়ে বললো, আমার গলাটা ধরে থাকো, বেশী জোরে না, আলতো করে—।

তারপর সে যুবতীকে নিয়ে সাঁতার দিল সামনের দিকে। আগন্তুকও ওদের ধরবার জন্য এগোলো। কিন্তু সে তরুণের মতন লম্বা নয়, গলা জল ছাড়াতেই কিছুক্ষণ আঁকুপাঁকু করে ডুবে গেল সে।

তরুণ পেছন ফিরে দেখলো লোকটির জলের সঙ্গে যুদ্ধ ও হেরে যাওয়া। সে

একেবারে ডুবে যেতেই তরুণ ফিরে এসে তাকে তুললো। লোকটি যাতে তাকে মরণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরতে না পারে, এই জন্য তরুণ তার ঘাড় ধরে দূরে দূরে সরিয়ে রাখলো এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তাকে ও যুবতীকে ফিরিয়ে আনলো কোমর জলে।

যুবতী দারুণ রেগে গেছে। নোনা জলে তার চোখ লাল, খানিকটা জল সে খেয়েও ফেলেছে। তীব্র গলায় সে বললো, তুমি ওকে তুললে কেন ? ও আমাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিল !

তরুণ হেসে বললো, না। ও অনেকটা খোকার মতন, তোমাকে হিংসে করছিল ... তোমাকে সাঁতার শেখাচ্ছি, ওকে শেখাচ্ছি না ... দ্যাখো না, খোকাও ওখানে কী রকম মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে আছে।

যুবতী বললো, ঐ বুড়ো-ধারীকে তুমি সাঁতার শেখাবে ? ওর লজ্জা করে না ! ও মানুষ নয় ! ও একটা জানোয়ার।

তরুণ যে এই মাত্র তার প্রাণ বাঁচিয়েছে এই বোধও হয়তো আগন্তুকের নেই। যুবতী তরুণকে জড়িয়ে ধরে আছে বলে সে হিংস্র মুখ করে যুবতীর দিকে এগিয়ে গেল।

তরুণ যুবতীকে বললো, তুমি একটু সরে দাঁড়াও তো। এখানে ঢেউ দেখলে লাফাবে। আমি ওকে একটু সাঁতার শেখাই।

ঠিক শিশুকে ভোলাবার মতন আদরের সুরে আগন্তুককে তরুণ বললো, এসো, তোমায় খুব ভালো করে শিখিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু শান্ত ছেলের মতন চুপ করে থাকবে কিন্তু।

আগন্তুকের দেহটা উপুড় করে ভাসিয়ে তরুণ তাকে হাত ছুঁড়তে শেখাতে লাগলো। ঢেউ-এর সময় সে ওকে শুদ্ধুই লাফিয়ে উঠছে।

বক্র দৃষ্টিতে যুবতী চেয়ে আছে তরুণের দিকে। তরুণেরও একটুও ভালো লাগছে না এই দারুণ ভারি চেহারার এক মাঝ-বয়েসী লোককে সাঁতার শেখাতে। কিন্তু তার এই ধৈর্যের ফলে বেশ কাজ হলো। একটু পরে লোকটিকে দাঁড় করিয়ে দিতেই সে এবার শান্ত হয়ে রইলো।

যুবতীকে তরুণ বললো, তুমি খোকার কাছে চলে যাও। আমি একলা একটু সাঁতার কেটে আসি।

যুবতী বললো, ওরে বাবারে, এত ঢেউ-এর মধ্যে আমি নিজে নিজে ফিরে যেতে পারবো না।

তরুণ বললো, ঠিক আছে, চলো, তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসছি।

যুবতী তরুণের গলা জড়িয়ে ধরে আবদার করে বললো, আমায় কোলে করে নিয়ে চলো !

তরুণ যুবতীকে দু'হাত দিয়ে নিজের বুকের কাছে তুলে নিলেও পরক্ষণেই কী ভেবে নামিয়ে দিল আবার। গম্ভীর ভাবে বললো, এখন নয়, তুমি আমার হাত ধরে চলো।

পাশ ফিরে সে আগন্তুককে হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকলো। আগন্তুক মুখ দিয়ে বিকৃত

শব্দ বার করতে শুরু করেছিল, তরুণের ডাক বুঝতে পেরে সে চুপ করে কাছে এলো। তরুণ দু'হাতে দু'জনকে ধরে নিয়ে চললো তীরের দিকে।

আগের দিন যুবতীর জামার একটা বোতাম ছিঁড়ে গেছে, আজ এতক্ষণ জলে ভিজে তার সুগোল, সুঠাম স্তন দুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আগন্তুক তরুণের পাশ দিয়ে মুখ ঝুঁকিয়ে বারবার দেখছে যুবতীর বুক। আবার জিভ বার করে ঠোঁট চাটছে, তাতে তার লোলুপতা আরও প্রকট হয়ে পড়ছে।

যুবতী এখানে এসে পর্যন্ত একবারও নারীসুলভ লজ্জা প্রদর্শন করেনি। এখন সে তার দুটি হাত আড়াআড়ি ভাবে রাখলো নিজের বুকে। তার মুখে ক্রোধ ও বেদনা ঠিক যেন আকাশের রক্তিম বর্ণ ও অন্ধকারের মতন মিশে যাচ্ছে। গতকাল ঠিক এই সময় সে ছিল দারুণ সুখী এক নারী, আর আজ তার মনের মধ্যে চলেছে প্রচণ্ড আলোড়ন।

পারের কাছাকাছি আসতেই খোকা অভিমানের সঙ্গে বললো, আমি আজ অনেক ভালো ভালো ঝিনুক পেয়েছি। তোমাদের দেখাবো না।

তরুণ বললো, খোকা, আজ অন্ধকার হয়ে গেল ... কাল আমি ঠিক তোকেই আগে সাঁতার শেখাবো। তোমরা সবাই একটু ওপরে গিয়ে বসো, আমি সাঁতার কেটে আসছি।

তরুণ পেছন ফেরা মাত্রই আগন্তুক পাঁজাকোলা করে বুকে তুলে নিল যুবতীকে। তারপর সে যুবতীর দুই স্তনে তার মুখ ঘষতে গেল।

যুবতী এমন তীক্ষ্ণ গলায় ই-ই-ই-ই করে আর্তনাদ তুললো যেন সে আকাশেও ফাটল ধরিয়ে দেবে। তার সমস্ত শরীর এমন ভাবে মোচড়াচ্ছে যেন কোনো বিন্দুই স্থির নেই।

তরুণ ফিরে তাকিয়ে সেই দৃশ্য দেখেই জল ছপছপিয়ে ছুটে এলো। কিন্তু সে আগন্তুকের বুক থেকে যুবতীকে সবলে ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলো না। সে আগন্তুকের সামনে দাঁড়িয়ে চোখে চোখ রেখে দৃঢ় স্বরে বললো, নামিয়ে দাও, শিগগির ওকে নিচে নামিয়ে দাও।

যেন কোনো দৈত্যকে আদেশ করছে তার প্রভু। সেই সঙ্গে তরুণ আঙুল দিয়ে ইঙ্গিতও করতে লাগলো। দু'তিনবার এ রকম করবার পর আগন্তুক আস্তে আস্তে যুবতীকে নামিয়ে দিল বালির ওপর।

খোকা ভয় পেয়ে খানিকটা দূরে সরে গিয়েছিল, এবারে সে কাছে এসে যুবতীকে জড়িয়ে ধরলো। যুবতী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো ব্যাকুলভাবে।

তরুণ সেদিকে না তাকিয়ে একবারও দৃষ্টি সরালো না আগন্তুকের চোখ থেকে। তার ডান হাতের তর্জনী ওপর থেকে নিচে নামিয়ে সে বলতে লাগলো, বসো ! বসে পড়ো ! ঐখানে বসে পড়ো ! আর কক্ষনো ওকে ভয় দেখাবে না। ওকে তুমি ধরবে না !

আগন্তুক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো তরুণের দিকে।

এবারে তরুণ এগিয়ে গিয়ে যুবতীর মাথার চুলে হাত ডুবিয়ে নরম ভাবে বললো, ঠিক হয়ে গেছে, সব ঠিক হয়ে গেছে। তুমি যে বলেছিলে আর কখনো তুমি কাঁদবে না ?

যুবতী অশ্রুসিক্ত অথচ জ্বলন্ত চোখ তুলে বললো, এর পরেও তুমি একলা সাঁতার কাটতে যাবে নিশ্চয়ই ?

তরুণ বললো, হ্যাঁ। ভয় নেই, ও আর কিছু করবে না। ও কিছুই বোঝে না।

যুবতী বললো, ছুরিটা ? ছুরিটা কোথায় ? ও যদি আমাকে আর একবার ছুঁতে আসে, আমি আত্মহত্যা করবো !

তরুণ বললো, তা কেন করবে ? ও যদি সত্যিই তোমাকে আবার ভয় দেখাতে আসে, তাহলে তুমি তখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করো। ছুরিটা ঐ যে বালির ওপরে আছে। তবে আমার মনে হয়, তার দরকার হবে না।

—তবু তুমি আমাদের ফেলে চলে যাবে ?

তরুণ আর কোনো উত্তর না দিয়ে জলে নেমে পড়লো। ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে সে চলে গেল দূরে, অন্ধকারে তাকে আর দেখা গেল না।

খোকাই বেল্ট সমেত ছুরিটা কুড়িয়ে এনে রাখলো যুবতীর কোলে। তারপর দু'জনে জড়াজড়ি করে বসে রইলো আড়ষ্ট ভাবে। মাঝে মাঝে চোরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে আগন্তুকের দিকে। আগন্তুক কিন্তু ওদের প্রতি আর মনোযোগ দিচ্ছে না, তার চোখ দুটি বিস্ফারিত, মুখখানা হাঁ করা, সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দূরের অন্ধকারের যে-দিকে তরুণ গেছে।

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, আবার বোধহয় বৃষ্টি আসবে।

যুবতী একবার ডান দিকে তাকিয়ে খানিক দূরে পড়ে থাকা ডলফিনগুলোর মৃতদেহ দেখলো। এই সমুদ্রের জলে কত বড় বড় প্রাণী থাকে, তবু অন্ধকারের মধ্যে তরুণ স্বেচ্ছায় গভীর জলে চলে গেল। তরুণের প্রতি রাগে যুবতীর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ উত্তপ্ত। যুবতী ভাবলো, এই রোমশ হিংস্র মানুষটাও কি জলের তলা থেকে এসেছে ?

আগন্তুক কিন্তু একই রকম ভঙ্গিতে স্থির ভাবে বসে আছে। একটু বাদে সে উঠে দাঁড়িয়ে তার প্যান্টটা খুলে ফেললো। তারপর ভিজে প্যান্টটা কাঁধের ওপর ফেলে সে চলে গেল ঘরের দিকে।

তরুণ ফিরে এসে বললো, ও কিছু করে নি নিশ্চয়ই ?

যুবতী কোনো উত্তর দিল না। খোকা বললে, ও ঘরের দিকে গেছে। আমরা ওর সঙ্গে এক ঘরে থাকবো না !

তরুণ বললো, তাহলে ও কোথায় থাকবে ? ও তো ঘর বানাতে পারবে না, ও কিছুই জানে না।

খোকা দাবির সুরে বললো, তুমি ওর জন্য আর একটা ঘর বানিয়ে দাও।

—তাই দেবো বলছিস ? ঠিক আছে, দেখবো এখন কাল। ওকে ভয় পাবার কিছু নেই, দেখিস, ওকে আমি ঠিক পোষ মানিয়ে দেবো।

সমুদ্র স্নানের ক্লান্তিতে তরুণ হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো মাটির ওপরে। আর তখনই শুরু হলো মিহিন বৃষ্টি। এক বেলার বেশী এই দ্বীপটি যেন বৃষ্টিবিহীন থাকতে

পারে না।

যুবতী ঠোঁট কামড়ে, গ্রীবা বাঁকিয়ে বসে আছে। সে যেন তরুণের দিকে তাকাতেও চায় না, তার সঙ্গে কথাও বলবে না ঠিক করেছে।

খোকা বললো, এই সমুদ্র, তুমি আগুন জ্বালবে না ?

তরুণ বললো, দাঁড়া, বাবা, একটু বিশ্রাম করে নি।

তরুণ চিৎ হয়ে আকাশ দেখতে লাগলো। মেঘ খুব জমাট না, ছেঁড়া ছেঁড়া, সুতরাং এখনি ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামার সম্ভাবনা নেই। কোথাও বোধহয় চাঁদ উঠেছে, তাই ক্ষীণ আলোও আছে।

তরুণ বললো, আকাশ, সমুদ্র, বৃষ্টি, জঙ্গল, এর মধ্যে কার সঙ্গে কার বেশী ভাব বল তো, খোকা ?

খোকা বললো, আকাশ আর সমুদ্র।

—ধুৎ ! বলতে পারলি না তো ! আকাশের সঙ্গে বৃষ্টিরই সব চেয়ে বেশী ভাব। দেখিস না, আকাশ আর বৃষ্টি সব সময় মিলেমিশে থাকে।

যেন একটা দারুণ রসিকতা করেছে এইভাবে হা-হা করে হেসে উঠলো তরুণ।

তারপর সে বললো, সবাই জঙ্গলকে ভয় পায়। কিন্তু দ্যাখ, জঙ্গল না থাকলে আমরা গাছ, লতা-পাতা কিছুই পেতাম না। এখানে ঘরও বানাতে পারতুম না। সব সময় খোলা জায়গায় থাকলে আমরা মরে যেতুম।

খোকা বললো, আর বৃষ্টি না হলে আমাদের পুকুরে জল জমতো না, আমরা জল খেতে পেতুম না।

—ঠিক বলেছিস ! আর আকাশ না থাকলে ... আকাশ না থাকলে কী হতো বল তো ?

—আকাশ না থাকলে সূর্যও থাকতো না, চাঁদও থাকতো না, দিনও থাকতো না, রাত্তিরও থাকতো না, আমিও থাকতুম না, তুমিও থাকতে না, কেউ থাকতো না।

—তোর কী বুদ্ধি রে খোকা ! আকাশ না থাকলে আমরা কেউই থাকতুম না। কিন্তু আকাশ কথা বলছে না কেন ?

এ প্রশ্নের কোনো উত্তর পাবার আগেই খোকা চেঁচিয়ে বললো, ঐ যে ও আবার আসছে।

তরুণ উঠে বসে দেখলো, একটা চলন্ত গাছের মতন দুলতে দুলতে এগিয়ে আসছে আগন্তুক। ওদের কাছাকাছি এসে থমকে দাঁড়ালো। মুখ দিয়ে আবার শব্দ করতে লাগলো অদ্ভুত ভাবে।

তরুণ উঠে এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলো। খুব স্বাভাবিক ভাবে বললো, কী হয়েছে তোমার, জঙ্গল ? একা একা ভালো লাগছে না ?

আগন্তুকের গলার আওয়াজ এবারে আর্তনাদের মতন শোনালো। হয়তো এটাই ওর কান্না। কিন্তু চোখে জল নেই।

তরুণ বললো, খিদে পেয়েছে ? চলো, আমি আগুন জ্বেলে তোমাদের খুব চমৎকার মাংস রান্না করে দিচ্ছি।

খোকাদের দিকে ফিরে সে বললো, তোমরাও চলে এসো। শুধু শুধু বৃষ্টি ভিজে কোনো লাভ নেই।

ঘরে ফিরে অনেক চেষ্টায় তরুণ আগুন জ্বাললো। তাকে ঘিরে বসে দেখতে লাগলো অন্যরা। তারপর মাংস সেঁকার ভার যুবতী নিজেই নিল। খাওয়া-দাওয়ার পর আগুনটাকে সরিয়ে রেখে শোওয়ার ব্যবস্থা করলো তরুণ। একদিকে যুবতী, তারপর খোকা, তারপর তরুণ, তারপর আগন্তুক। সে রাত্তিরটা বিনা ঘটনায় কেটে গেল।

পরের দিনও চলতে লাগলো একই রকম ভাবে। বৃষ্টি আর রোদ পালা করে এলো সমান সমান পরিমাণে। তরুণের ইচ্ছে জঙ্গলের উল্টো দিকটা ঘুরে দেখে আসার। কিন্তু তার একা কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। খোকা আর যুবতী আগন্তুকের সঙ্গে কিছুতেই আলাদা থাকতে চায় না। আগন্তুক এর মধ্যে আর কোনো বিসদৃশ কাজ করেছে তা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝে বিকৃত মুখভঙ্গি আর বিকট কণ্ঠস্বর শুনেই ওরা ভয় পায়। আর আগন্তুককেও একলা কোথাও রাখা যায় না এক মুহূর্তও। যুবতী যখনই তরুণের কাছাকাছি আসে, অমনি আগন্তুকও তরুণের পাশে এসে দাঁড়াবেই।

এদের সকলকে সামলে নিয়ে বেশীদূর যাওয়ার কথা ভেবেই তরুণ নিরুদ্যম হয়ে যায়। খোকা আর যুবতী আগন্তুককে ক্রমশই বেশী অপছন্দ করছে, তারা অনবরত ওর নামে নালিশ জানায়। আগন্তুকেরও কিছু দোষ আছে। সে খোকাকে একদম গ্রাহ্যই করে না, খোকার দিকে তাকায়ও না। কিন্তু প্রায় সর্বক্ষণই সে যুবতীর মুখ ও বুকের দিকে লোভীর মতন চেয়ে থাকে, সেই সময় তার জিভেও চকাস চকাস শব্দ হয়। এক এক সময় সে যুবতীর দিকে তাকিয়ে নিজের পুরুষাঙ্গে হাত রাখে। তখনও তাকে মানুষ বলে মনে হয় না, তার সমস্ত হাবভাবই পশুর মতন।

তরুণ তাকে গুরুজনের মতন সস্নেহ বকুনি দেয়, কখনো পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে। যুবতীর খুব কাছে তাকে যেতে দেয় না, সে কোনো অছিলায় তাকে নিয়ে একটু দূরে সরে যায়। সে জানে, বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করা ছাড়া এই লোকটিকে বশ করবার আর কোনো উপায় নেই।

রোদ্দুরের তাপ খুব বেশী নয় বলে ডলফিনগুলো দ্বিতীয় দিনেও পচে নি। তাদের মাংস বেশ খাওয়া যায়। কুকুরগুলো আজও এসে আর একটা ডলফিনকে শেষ করলো, মানুষদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলো না।

তরুণ তবু গোটা পাঁচেক কচ্ছপ ধরে বেঁধে রেখে দিল ঘরের পেছনে। দুর্দিনের কথা বলা যায় না। আবার যদি সেই রকম একটানা ঝড়-বৃষ্টি আসে, তাহলে তার জন্য সঞ্চয় দরকার।

যুবতী আর কাঁদবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিলেও আজ সন্ধেবেলা সে কাঁদলো অঝোরে। কারুর বিরুদ্ধে অভিযোগ নেই, রাগারাগি নেই, এমনি এমনি কান্না। তরুণ

সান্ত্বনা দিতে জানে না, খোকাই বরং যুবতীর পিঠে হাত বুলিয়ে অনেক মিষ্টি মিষ্টি কথা বললো। তরুণ শুধু বেল্ট সমেত ছুরিটা যুবতীকে ফিরিয়ে দিয়ে বললো, এটা তোমার কাছেই রাখো, সব সময় রাখবে কোমরে।

রাত্রিটা কাটলো আগের রাত্রির মতন।

আবার আর একটা দিন এলো। সব কিছুই অন্যান্য দিনের মতন, কিন্তু মানুষগুলোর মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, ওদের মনে শান্তি নেই। আগন্তুককে নিয়ে সমস্যা বেড়েই চলেছে। এখন সে সব সময়ই অস্থির, তার জিভ নাড়া ও অদ্ভুত শব্দ বার করা থামেই না। আঠার মতন সে যুবতী ও তরুণের সঙ্গে লেগে থাকে।

তরুণেরও কপাল কুঁচকে গেছে। আগন্তুককে নিয়ে কী করা যায় সে বুঝতে পারছে না। যুবতীকে নিয়ে সে নিজে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য আলাদা থাকতে চায়। খোকাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঘরে রেখে যাওয়া যেত। কিন্তু আগন্তুককে নিবৃত্ত করবার উপায় নেই।

যুবতীকে খুশী করবার জন্য আজ তরুণ তাদের ঘরের কাছের গোল-পাতা গাছটির অনেক পাতা জড়ো করে সেগুলোর বোঁটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে তা দিয়ে পাতাগুলো গাঁথতে লাগলো। আস্তে আস্তে তৈরি হলো যুবতীর জন্য ঘাগড়ার মতন একটা পোশাক।

যুবতী তার প্যান্টের ওপরেই কোমরে বেড় দিয়ে যেই পরীক্ষা করতে গেল পোশাকটা, অমনি আগন্তুক তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে কেড়ে নিল সেটা। গর্জনের মতন শব্দ করে পোশাকটাকে তিন টুকরো করে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে।

এবার তরুণের চোখ জ্বলে উঠলো, কঠিন হয়ে এলো চোয়াল।

সে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল আগন্তুকের দিকে। আগন্তুকও গোঁয়ারের মতন ঘাড় বেঁকিয়ে হিংস্রভাবে তাকিয়ে রইলো।

শেষ মুহূর্তে তরুণ বুঝলো, মাথা গরম করে লাভ নেই। একে কোনো শাস্তি দিতে গেলে এ তরুণকেও ঐ পোশাকটার মতন ছিঁড়ে তিন টুকরো করে দিতে পারে। আক্রমণোদ্যত প্রাণীর মতন আগন্তুকের শরীরের সমস্ত পেশী ফুলে উঠেছে।

তরুণ তার মুখ নরম করে হাসলো। তারপর এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল ওর দিকে। যুবতী আগন্তুকের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে গিয়েছিল, খানিকটা গড়িয়ে গিয়ে সে তার ছুরির বাঁট চেপে ধরেছে। সেদিকে না তাকিয়েই তরুণ বললো, ওটা বার করো না। আমি দেখছি।

ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে তরুণ বললো, কী হয়েছে, জঙ্গল ? এত রাগ কেন ? এই পোশাকটা তোমার পছন্দ হয় নি ? তোমার একটা ঐ রকম চাই ? আচ্ছা, বানিয়ে দেবো, তোমাকে আরও ভালো বানিয়ে দেবো।

আগন্তুকের কাঁধে তরুণ হাত রাখতেই সে গ-র-র গ-র-র আওয়াজ করে উঠলো। সে কি বলতে চায় সে-ই জানে। কিন্তু সে তরুণকে আঘাত করার চেষ্টা করলো না।

তরুণ মুখের কাছে হাত দিয়ে খাবার খাওয়ার ইঙ্গিত করলো। সে লক্ষ করেছে, একমাত্র খাদ্য পেলেই, কিংবা খাবার রান্নার সময় সে যুবতীর গা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে

খাদ্যের দিকে মনোযোগ দিয়ে থাকে। যদিও মাত্র কিছুক্ষণ আগেই ওরা আহার সেরে নিয়েছে, তবু তরুণ ওকে নিয়ে গেল ঘরের দিকে। তারপর একটা বন্দী কচ্ছপকে টেনে এনে অনেকক্ষণ সময় লাগালো সেটাকে কেটেকুটে মাংস তৈরি করতে। সে শুয়োরের দাঁতের ছুরি ব্যবহার করলো অনেকদিন বাদে।

সন্ধের পর থেকেই হাওয়া বেশ তেজী হয়ে গেল। তার সঙ্গে মিশে গেল গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি। ঠিক সেইরকমই চললো অনেকক্ষণ। ঠিক ঝড় ওঠে নি, মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে শিসের মতন আওয়াজ। আর সমুদ্রের ঢেউও প্রবল হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়লো ওরা। শুয়ে শুয়ে তরুণ শুনতে লাগলো হাওয়া আর সমুদ্রের মেলামেশা ধ্বনি। তরুণ একবারও চোখের পাতা বোঁজালো না। আজ রাতে তার ঘুমোবার কথা নয়। একটা অশুভ আশঙ্কায় তার বুক কাঁপছে, যে আজ রাতেই একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটবে। যদিও বৃষ্টি সেরকম পড়ছে না, খুব একটা বড় ঝড়ও শুরু হয় নি।

অনেকক্ষণ পর যুবতী উঠে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আগন্তুকের নাক ডাকে। অন্যান্য রাত্রে তরুণ লক্ষ করেছে, ও সারারাত একটুও নড়াচড়া করে না। ঘুমোবার পরই ও পাথর।

যুবতী বেরিয়ে যাবার পরও একটুক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর তরুণ খুব আস্তে আস্তে উঠলো। আগন্তুকের নাক ডাকা শুনলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

গোল-পাতা গাছটায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুবতী। কোনো বাক্য বিনিময় না করে দু' জনে ছুটলো সামনের দিকে। যুবতীর একটা হাত ধরে রইলো তরুণ, যুবতীর অন্য হাতে সেই পাতার পোশাকটা। সেটা সে নিজেই জুড়েছে।

খানিকটা যাবার পর যুবতী বললো, চলো, আমাদের সেই বড় পাথরটার কাছে যাই। ঐ জায়গাটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।

—চলো!

—সেদিন আমরা ঝড়ে উল্টে উল্টে পড়ে যাচ্ছিলুম, মনে আছে? মনে হচ্ছে যেন কতদিন আগেকার কথা। আজকের রাতটা কিন্তু খুব সুন্দর। কী চমৎকার হাওয়া।

পাথরটার কাছে পৌঁছে ওরা দু' জনে পাশাপাশি বসে হাঁপাতে লাগলো। একটু দম নেবার পর যুবতী তরুণের চুলের মধ্যে নিজের ডান হাতটা ডুবিয়ে আদর করতে করতে কাতর গলায় বললো, ঐ জন্তুটাকে নিয়ে আমরা দিনের পর দিন কী করে থাকবো?

তরুণ বললো, এখন ওর কথা থাক। এসো, এখন আমরা শুধু নিজেদের কথা বলি। অন্যসময় সময় পাই না—।

—বলো, তা হলে তুমি কিছু বলো।

—আমি? আমি তো কিছু···আমার তো কিছু মনে পড়ে না। কী বলবো? তুমি বলো—।

—তুমি কিছু কথা বলো না। তুমি সমুদ্রের মতন শান্ত, কিন্তু সমুদ্রের তো ঢেউ ওঠে, তোমার ওঠে না?

—হ্যাঁ, আমার ঢেউ ওঠে। এখন ঢেউ উঠেছে। আকাশ, তোমার পাশে এরকমভাবে বসলে আমার খুব ভালো লাগে।

সে যুবতীর বুকে মুখ রাখলো। যুবতী আদর করতে লাগলো তার চুলে।

তরুণ মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলো, আকাশ, তোমার বুক এত গরম কেন?

যুবতী বললো, সমুদ্র, তুমি আমাকে ছুঁলেই আমাব এরকম হয়। কিন্তু ঐ লোকটা থাকলে আমরা কী করে···

—আবার ওর কথা?

—তা হলে এবার আমি তোমার বুকে মুখ রাখি?

তরুণের বুক জিভ দিয়ে চাটতে চাটতে তরুণী বললো, তোমার বুক কী নোন্‌তা!

—কিন্তু আকাশ, তোমার বুক খুব মিষ্টি।

—এই তো তুমি কথা বলতে জানো। কে বললো তুমি কথা বলতে পারো না! আমার জিভটা কেমন দ্যাখো তো, এটাও মিষ্টি?

—গরম। খুব গরম।

—তুমি যে পোশাকটা বানিয়ে দিয়েছো, সেটা পরবো?

—পরো, দেখি তো তোমায় কেমন দেখায়।

—ঐ পাজীটা আমায় ইচ্ছে মতন পোশাকও পরতে দেবে না? আর তুমি সব সময় ওকে ক্ষমা করে দিচ্ছো।

—আবার? এসো, আমরা ওকে একদম ভুলে যাই।

প্যাণ্ট খুলে ফেলে উঠে দাঁড়িয়ে যুবতী পাতার ঘাগড়াটি পরে নিল। তারপর দু' হাত বাড়িয়ে বললো, এসো—।

তরুণ হাঁটুগেড়ে বসে বললো, তুমি কেমন বদলে গেলে। এখন মনে হচ্ছে, তুমি এই দ্বীপেরই···

যুবতীর উরু ধরে কাছে টেনে এনে সে তার শরীরের ঘ্রাণ নিল। সবুজ পাতায় গন্ধের সঙ্গে মিশে রয়েছে নারীর নিজস্ব গন্ধ। পাতার মধ্যে মুখ ডুবিয়ে দিয়ে তরুণ যেন অরণ্যে হারিয়ে গেছে।

যুবতী তরুণের চুলের মুঠি ধরে তাকে টেনে তুলে বললো, চলো, আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

—কোথায়?

—কাল তুমি আমায় পিঠে নিয়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটছিলে, সেই রকম ভাবে আমরা সমুদ্রে ভেসে পড়বো।

—কী আছে সমুদ্রের ঐ পারে? সমুদ্রে ভেসে ভেসে আমরা কতদূরে যাবো?

—তা হলে ঐ জঙ্গলের অন্যদিকে।

—কিন্তু খোকা !

—ও, তাই তো। খোকাকে ছেড়ে আমিও যেতে পারবো না।

—আকাশ, তুমি সেদিন আমায় নাচ দেখিয়েছিলে। আজ আমায় আবার নাচ শেখাবে ? সেই সব কিছু ঘুরবে, একবার আমি আকাশে উঠে যাবো, একবার সমুদ্রে—

—এসো....

॥ ১১ ॥

দ্বিতীয় পর্দাটির দিকে কারুর চোখ ছিল না। দ্বিতীয়া মাঝে মাঝে নজর রেখেছিলেন, হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, এবারে ডান দিকে দেখুন !

সবাই এক সঙ্গে সেদিকে মুখ ফেরালেন।

এখন আকাশ গবেষণাগারের এই ছোট ঘরটির সব কটি আসনই পূর্ণ। ষষ্ঠ আসনটিতে বসেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিবেশ সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি। যদিও সভাপতি শব্দটি শুনলেই কোনো ভারী চেহারার প্রৌঢ়ের কথা মনে হয়, কিন্তু ইনি খুবই রোগা-পাতলা এবং স্বল্পভাষী মানুষ। কয়েকদিন আগে অতি দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় এই পরীক্ষামূলক দ্বীপটির জীবনের কোনো ছবিই আর্থ স্টেশানে পৌঁছোচ্ছিল না, সেখানে ওঁরা ভেবেছিলেন সব কিছু বুঝি শেষ হয়ে গেছে। সেই জন্যই উনি সরাসরি দৃশ্য দেখবার জন্য ওপরে চলে এসেছেন।

ডান দিকের পর্দাটি প্রায় অন্ধকার। শুধু কাঠের গুঁড়িটির ধিকিধিকি আগুনের খানিকটা আভা টের পাওয়া যাচ্ছে। এবার তাকেই দেখা গেল, অন্ধকারের মধ্যে কিছু একটা নড়ছে। একটা বড় কোনো ছায়া।

কবি বললেন, এই রে, গোরিলাটি জেগে উঠেছে মনে হচ্ছে।

প্রথম বললেন, হ্যাঁ, ছোট ছেলেটি নয়, ছায়াটা অনেক বড়। ঝুঁকে ঝুঁকে কী যেন দেখছে।

সভাপতি বললেন, এইবার ও গোলমাল পাকাবে।

সভাপতির ডান পাশেই বসেছেন মহাশয়া। তিনি মুখ ঝুঁকিয়ে অত্যন্ত দুঃখিত আবেগের সঙ্গে বললেন, আপনারা ঐ অসভ্য, বর্বর নরপশুটিকে ওখানে পাঠালেন কেন বলতে পারেন ? ঐ দানবটা যাবার আগে ওরা তিনজন কত সুখী ছিল ! ওরা খেতে পায়নি, ওরা ঝড়, বৃষ্টি আর কুকুর আর খিদের সঙ্গে লড়েছে, তবু ওদের জীবন নির্মল ছিল। আর এই হিংস্র বর্বরটা যাবার পরই সব নষ্ট হয়ে গেল।

সভাপতি সবিস্ময়ে বললেন, হিংস্র বর্বর ? মৃত্যুর আগে ঐ লোকটা কে ছিল জানেন ?

এবারে মহাশয়ার বিস্মিত হবার পালা। মুখখানা সরিয়ে এনে তিনি বললেন, মৃত্যুর আগে ? তার মানে ?

সভাপতি একটু থতমতো খেয়ে বললেন, তার মানে...মানে বলছি আর কি, ওর আগের জীবনে, মানে স্মৃতি হারাবার আগে...

তিন বৈজ্ঞানিক এক সঙ্গে গলা খাঁকারি দিলেন।

সভাপতি সেদিকে মনোযোগ না দিয়ে বললেন, এর আগে উনি ছিলেন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। ওঁর নাম বব্ ওয়াইজ। ওর ছাত্র-ছাত্রীরা আড়ালে ওকে বলতো বব্ দানব।

তৃতীয় বললেন, স্যার, এদের পূর্ব পরিচয় আমাদের এখনই জানাবার কথা নয়।

সভাপতি বললেন, ও, আমি দুঃখিত। ভুলে গিয়েছিলাম।

মহাশয়া অস্ফুট স্বরে বললেন, ঐ রকম বীভৎস চেহারা, ও ছিল নাম করা অধ্যাপক ?

কবি বললেন, চেহারার সঙ্গে অধ্যাপনার কী সম্পর্ক, মহাশয়া ? অনেক নাম করা অধ্যাপকই চলচ্চিত্রের নায়কদের মতন সুপুরুষ নন। নোবেল পুরস্কারজয়ী হান্স হিলহেল্মের চেহারা একটি মালয়েশিয়ার বাঁদরের মতন। এমনকি অনেক কবির চেহারাও...

মহাশয়া বললেন, শুধু চেহারা কেন ? ঐ রকম পাহাড়ী ভাল্লুকের মতন গলার আওয়াজ আর গিরগিটির মতন জিভ বার করা স্বভাব....

তৃতীয় বললেন, তার অবশ্য সহজ ব্যাখ্যা আছে। আগের জীবনে বব ওয়াইজ ছিলেন অত্যন্ত ধূমপায়ী এবং মদ্যপায়ী। শেষের দিকে উনি এত বেশী মদ্যপান শুরু করেছিলেন যে ওঁর চাকরি যাবার কথা উঠেছিল। শুধু অত পণ্ডিত বলেই...। তারপর যখন ওঁর স্মৃতি নষ্ট হয়ে যায়—

কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে মহাশয়া বললেন, আপনারা যে ওদের স্মৃতি নষ্ট করে দিয়েছেন, আবার তা ফেরৎ দিতে পারবেন ?

দুদিকে মাথা নেড়ে তৃতীয় বললেন, না। আমরা অনেক কিছুই শুধু নষ্ট করে দিতে পারি, কিন্তু ফিরিয়ে আনতে পারি না। যদি স্মৃতি ফিরিয়ে আনার সাধ্য বৈজ্ঞানিকদের থাকতো, তা হলে পৃথিবীতে আর একটিও উন্মাদ থাকতো না।

—যা ফিরিয়ে আনার সাধ্য আপনাদের নেই...তা আপনারা...মানে, ওদের স্মৃতি আপনারা নষ্ট করলেন কোন্ অধিকারে ?

—সে রকম স্পষ্ট অধিকার নেই, আবার আছেও বটে। তবে একটা কথা বলতে পারি, এদের ক্ষেত্রে স্মৃতি নষ্ট করে কিন্তু আশ্চর্য ভালো ফল পাওয়া গেছে। বিশেষ করে ঐ তরুণ ছেলেটার—

—সে কথা আমি জানতে চাই না। এই কয়েক জন সুস্থ মানুষের স্মৃতি আপনারা নষ্ট করলেন কেন ? মানুষকে নিয়ে যা-খুশী করার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে ?

—তার আগে বলুন তো মানুষ জাতিটাকেই লুপ্ত করে দেবার অধিকার মানুষকে কে দিয়েছে ?

কবি ওঁদের বাধা দিয়ে বললেন, মহাশয়া, এখন এই তর্ক চালিয়ে গিয়ে লাভ নেই। দ্যাখো, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ভাই তৃতীয়, তুমি বব্ ওয়াইজের আগেকার স্বভাব সম্পর্কে কী বলছিলে ?

—বিখ্যাত ফলিত গণিতের অধ্যাপক বব্ ওয়াইজের মদ ও তামাকের অত্যন্ত বেশী নেশা ছিল। উনি একলা থাকতেন। সিগারেটের আগুন থেকেই ওর ঘরে আগুন লাগে, তখন উনি অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণের ফলে অপ্রকৃতিস্থ, সেই জন্য সাংঘাতিকভাবে পুড়ে যান। সবচেয়ে বেশী জখম হয় ওঁর মস্তিষ্ক। স্মৃতি তো নষ্ট হয়েছেই, কথা বলার ক্ষমতাও হারিয়েছেন, কণ্ঠস্বর ঐ রকম বিকৃত হয়ে গেছে।

—তা হলে ওর স্মৃতি আপনারা নষ্ট করেননি ?

—অন্তত ওঁর জন্য আমাদের কিছু করতে হয়নি। যাই হোক, ওঁর যে আগে মদ ও সিগারেটের সাঙ্ঘাতিক নেশা ছিল, সে কথা ওঁর মনে নেই বটে, কিন্তু নেশা শরীরের ওপর দাবি সহজে ছাড়ে না। ঠিক সময়ে নেশার জিনিস না পেলে মানুষ খিটখিটে ও বদমেজাজী হয়ে যায়। সব সময় গলা ও ঠোঁট শুকনো মনে হয়। এ সবই উইথড্রয়াল সিনড্রম—

মহাশয়া তবু উত্তপ্তভাবে জিজ্ঞেস করলেন, স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেছে, এখন তো ও আর অঙ্কের পণ্ডিত নয়, ও একটা জন্তু। ওকে পাঠালেন কেন ঐ দ্বীপে ?

—স্মৃতি নষ্ট হলেই যে অঙ্কের অধ্যাপক একটা জন্তু হয়ে যাবে, তা কি আগে কারুর জানা ছিল ? তা ছাড়া যে-অবস্থার কথা কল্পনা করে আমরা এই পরীক্ষা চালাচ্ছি, তাতে ঐ দ্বীপে যে কোন্ কোন্ ধরনের মানুষ যেতে পারে, তারও তো কোনো ঠিক নেই। সবাই যে সুস্থ, সক্ষম দেহ হবে···অসুস্থ, বিকলাঙ্গ বদ্ধ উন্মাদও ঐ দলে ভিড়তে পারে···

—ছেলেটি, মেয়েটি আর বাচ্চা ছেলেটি, ওদের তিন জনকে নিয়ে বড় সুন্দর একটা ব্যাপার গড়ে উঠেছিল।

—মহাশয়া, আপনি নিজেই তো এক সময় বলেছিলেন যে এটা চলচ্চিত্র নয়, মানুষের জীবন। আমরা যা দেখছি, তাকে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসও বলতে পারেন।

কবি বললেন, লোকটা ঘর থেকে বেরিয়ে ওদের খুঁজছে।

ঠিক প্রথম দিন যে-রকম দেখা গিয়েছিল; সেইরকম ভাবেই দৈত্যাকৃতি লোকটি টলতে টলতে যাচ্ছে এদিক ওদিক। আজ ঝড়ের ধাক্কা না থাকলেও সে ক্রোধ ও বিদ্বেষে অন্ধ। মুখ দিয়ে গ-র-র গ-র-র শব্দ বেরুচ্ছে।

বাঁ দিকের টিভি পর্দায় দেখা যাচ্ছে, স্বপ্নের মতন স্বল্পালোকে খুব মন্থর ভাবে নাচছে তরুণ আর যুবতী। ওদের গালে গাল ঠেকানো, মাঝে মাঝে ওরা ওষ্ঠ চুম্বন করছে। ওরা সময় ও পৃথিবী বিস্মৃত।

কবি বললেন, আমি ঘড়িতে নোট করেছি, এই যুবক-যুবতী এই নির্জন জায়গায় ঠিক এক ঘণ্টা দশ মিনিট আছে, কিন্তু এখনো ওরা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়নি দু'জনে, একবারও পরিপূর্ণ যৌন-ক্রিয়া করে নি। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, পৃথিবীর আর কোথাও এরকম নিরালায় এক জোড়া ছেলে মেয়ে এতখানি সংযম দেখাতে পারবে না।

দ্বিতীয়া উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নিছক যৌন-ক্রিয়ার চেয়েও অনেক বেশী আনন্দ ওরা পাচ্ছে পরস্পরের সাহচর্যে।

—সেরকম আনন্দ আজও পাওয়া যায় ? এই বিংশ শতাব্দীর শেষেও ?

দ্বিতীয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, অন্তত একটি যুগল যে অলৌকিক আনন্দে ডুবে রয়েছে, তা তো আমরা নিজের চোখেই দেখছি। ওরা এমন জায়গায় রয়েছে, যেখানে শতাব্দীর গণনা শুরু হয় নি।

মহাশয়া বললেন, এই সময় একজন তৃতীয় ব্যক্তি...একটা হৃদয়হীন, মস্তিষ্কহীন হিংস্র জন্তু ওদের বাধা দেবে...এর চেয়ে নিষ্ঠুর আর কিছু হয় না।

প্রথম বললেন, দ্বিতীয়া, তোমার এবার ই ই জি মেশিনের কাছে যাওয়া দরকার—।

দ্বিতীয়া বললেন, জানি, সেই জন্যই তো উঠে দাঁড়িয়েছি। আমি আর এই সুন্দর দৃশ্যটি দেখতে পাবো না।

—তা হলে তোমার বদলে আমি বসবো ওখানে ?

—না, ঠিক আছে।

দ্বিতীয়া উঠে গিয়ে বসলেন চৌকো বাক্সটার পেছনে। বাকি পাঁচজন অনবরত মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন দুটি পর্দাই এক সঙ্গে।

আগন্তুক চলে এসেছে সমুদ্রের ধারে। প্রত্যেকটা মৃত ডলফিনের কাছে গিয়ে সে উঁকি মেরে মেরে দেখছে, ওখানেই তরুণ আর যুবতী লুকিয়ে আছে কি না।

তারপর সে গেল জলের ধারে। দূরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে গজরাতে লাগলো। যেন তার ধারণা, তরুণ আর যুবতী তাকে ফাঁকি দিয়ে এই গভীর রাতে সাঁতার শেখার খেলা খেলতে গেছে।

কিসে যেন ধাক্কা লেগে আগন্তুক সেখানে আছাড় খেয়ে পড়লো।

মহাশয়া তাঁর হাত দুটি জোড় করে চিবুকে ঠেকিয়ে চোখ বুঁজে বললেন, হে ভগবান, ও যেন ঐ যুবক-যুবতীকে খুঁজে না পায়। ও যেন ওখানেই কোনো আঘাত পেয়ে আহত হয়, আর হাঁটতে না পারে....

কবি বললেন, ব্যাপার কি, মহাশয়া ? ভগবান নামে একটা পৌরাণিক জীবের প্রতি তোমার বিশ্বাস আছে, তা তো আগে বোঝা যায় নি !

—আগে কখনো বিশ্বাস করি নি। কিন্তু এখন আর কাকে ডাকবো ? ভগবানের কথাই মনে পড়লো।

—ভগবান শুধু ঐ দু'জন ছেলেমেয়েকে বাঁচাবেন ? গোটা মানুষজাতিকে বাঁচাচ্ছেন না কেন ? হিরোশিমায় এমন প্রেমিক-প্রেমিকা ছিল না ?

আগন্তুক আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। যাতে তার ধাক্কা লেগেছে সেটা একটা বড় পাথর। এখানে জলের মধ্যে পাথর আগে ছিল না। সমুদ্রের জল এখন ডলফিনগুলোকে ছুঁয়েছে।

মহাশয়া বললেন, এই লোকটার আগের পরিচয় আমরা জেনে ফেলেছি। অন্যদের পরিচয় কেন বলবেন না? কী আপনাদের বাধা?

সভাপতি বললেন, এখন বোধহয় বলা যায়। প্রথম, আপনার আপত্তি আছে?

প্রথম বললেন, তা হলে আপনিই বলুন।

সভাপতি বললেন, আপনারা এখন বুঝতেই পারছেন যে এই রকম একটা পরীক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক-সেবিকা পাওয়া কত শক্ত। সেইজন্য আমরা শুধু মৃতদের গ্রহণ করেছি। এক হিসেবে এরা সবাই মৃত।

কবি ও মহাশয়া এক সঙ্গে বলে উঠলেন, মৃত?

সভাপতি বললেন, হ্যাঁ। ক্লিনিক্যালি ডেড যাকে বলে। চিকিৎসাকরা এদের মৃত্যুর সারটিফিকেট দিয়েছিলেন। তারপর আবার ওদের বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে।

মহাশয়া বললেন, সেটা কি করে সম্ভব?

কবি বললেন, দৈবাৎ কোনো কোনো মৃত লোকও বেঁচে উঠতে পারে বটে—

সভাপতি বললেন, না, সেরকম নয়। এদের বাঁচানো হয়েছে। অ্যামিনো অ্যাসিড সহযোগে নতুন একটি ওষুধ দিয়ে মৃত্যুর ত্রিশ ঘণ্টার পরেও মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা যায়। তবে এই ওষুধ মানুষের ওপর প্রয়োগ করা হবে কিনা তার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি এখনো।

—কেন?

—অনেক দেশেই মানুষের গড় আয়ু এখন একশো দশ বছর। তার পরেও কি মৃতদের বাঁচানো উচিত? এই ওষুধের সুযোগ নেবে শুধু ধনীরাই। গর্ভের সন্তানকে ইচ্ছে মতন ছেলে বা মেয়েতে পরিণত করার ওষুধ যেমন সারা পৃথিবীতে অবৈধ হয়ে গেছে, হয়তো এই ওষুধও সেরকম অবৈধ হবে। আমরা বিশেষ অনুমতি নিয়ে শুধু এই পরীক্ষার জন্যই এদের ওপর সেই ওষুধ প্রয়োগ করেছি। সেইজন্যই ওদের আর কখনো ফিরিয়ে আনা যাবে না।

—ফিরিয়ে আনা যাবে না?

—না। মৃত মানুষদের জীবিতদের জগতে ফিরিয়ে আনার অধিকার রাষ্ট্রপুঞ্জের সর্বোচ্চ কমিটি আমাদের দেয় নি। অবশ্য এমনও হতে পারে যে, বাকি সবাই মরে যাবে, ওরাই শুধু বাঁচবে।

—এরা সবাই এক দেশের মানুষ?

—কাছাকাছি জায়গার। এদের মাতৃভাষা এক। তবে কেউ কারুর পরিচিত নয়। এরা মৃত এবং এদের কোনো নিকট আত্মীয়ও নেই। বব্ ওয়াইজ আমেরিকার অধ্যাপক, জাতে মুলাটো। আগুনে পুড়ে তার মৃত্যুর খবর অনেক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

মৃত্যুর একুশ ঘণ্টা পরে অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে ওঁর প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে আনা হয়। তার এক মাসের মধ্যেও ওঁর মৃতদেহ কেউ দাবি করতে আসে নি। তখন উনি আমাদের সম্পত্তি হয়ে যান।

—ঐ বাচ্চা ছেলেটিরও কেউ নেই?

—ঐ বাচ্চাটা একটা অনাথ আশ্রমের সাততলার জানলা ভেঙে লাফিয়ে পড়েছিল নিচে। আর ঐ যুবতীকে পাওয়া যায় মরোক্কোতে। ওর সঙ্গে একজন যুবক ছিল। দু'জনেই হোটেলের ঘরে শুয়ে আত্মহত্যা করে। সম্ভবত অন্য কোনো দেশ থেকে ওরা মরক্কোয় পালিয়ে গিয়েছিল। মৃত্যুর ঠিক উনত্রিশ ঘণ্টা পরে ওদের দু'জনকেই অ্যামিনো অ্যাসিড দেওয়া হয়। ছেলেটি বাঁচে নি, মেয়েটি বেঁচে ওঠে। পৃথিবীর বিভিন্ন সংবাদপত্রে ওর ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন করা হয়েছিল, কেউ ওর মৃতদেহ দাবি করে নি। মেয়েটি চিত্রশিল্পী, বড় বড় ক্যানভাসে ছবি আঁকতো। কোন্ মানসিক আবেগে ও আত্মহত্যা করেছিল তা আমরা জানি না।

—বাঁচিয়ে তোলার পর, ওরা এইরকম একটা পরীক্ষায় অংশ নিতে চায় কিনা, সে মতামত নেওয়া হয়েছিল ওদের কাছ থেকে?

—তার প্রশ্নই ওঠে না। বাঁচিয়ে তোলার পরও ওদের দীর্ঘকাল অজ্ঞান করে রাখা হয়েছিল। এই দ্বীপে পাঠাবার আগে ওদের কোনো ক্রমেই জীবিতদের জগতে ফিরিয়ে নেওয়া চলবে না। এটাই ছিল শর্ত। বুঝতে পারছেন না, মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে এই খবর একবার রটে গেলে তার ফল কত মারাত্মক হতে পারে।

—আর ঐ তরুণ ছেলেটি?

—ওর ব্যাপারটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের।

তৃতীয় বললেন, বব ওয়াইজ কিন্তু এখন ঠিক দিকে যাচ্ছে।

সবাই আবার সচকিত হলেন। আগন্তুক রাগের চোটে দু' হাত ছুঁড়ে ছুঁড়ে যেন বাতাসকেই জাপটে ধরবার চেষ্টা করছে। এবং সে এগোচ্ছে উঁচু জায়গাটার দিকে। পায়ে পাথরের চোট লাগায় সে আরও ক্রুদ্ধ হয়েছে।

সমুদ্রের জলে সর-সর-সর-সর শব্দ হচ্ছে। ঢেউয়ের আওয়াজ যেন থেমে গেছে, এ এক অন্য রকম শব্দ।

অন্য পর্দায় দেখা যাচ্ছে, তরুণ আর যুবতী নাচ থামিয়ে বড় পাথরটার গায়ে হেলান দিয়েছে এখন। দু'জনে দু'জনের কাঁধ ধরে আছে। আকাশে পরিষ্কার গোল চাঁদ। ওরা সেই চাঁদ দেখছে।

মহাশয়া জিজ্ঞেস করলেন, এই তরুণটির কথা আপনি বলছিলেন ....

—ও ছিল ফাঁসীর আসামী।

—অ্যাঁ? ফাঁসী? কেন? বিপ্লবী?

—না। ও খুনী। মোট চারটি খুন করেছে, তার মধ্যে একটি চব্বিশ বছরের মেয়েকে, গলা টিপে।

—কী বলছেন আপনি !

—আমরা সবাই বিস্মিত ওকে দেখে। ওর ফাঁসীর পঁচিশঘণ্টা পরে ওকে বাঁচানো হয়।

—কিন্তু ওর এত নরম স্বভাব, এমন দায়িত্ববান, ভদ্র ছেলে...

অন্য জায়গা থেকে মুখ ফিরিয়ে দ্বিতীয়া বললেন, হয়তো ওর বাল্যকাল ছিল খুবই সৎ আর মধুর।

মহাশয়া বললেন, এরকম মানুষ যে ফাঁসীর আসামী হতে পারে কল্পনাই করা যায় না

—অনেক কমনীয় কিশোরকেই এই পৃথিবী খুনী করে তোলে ....

তৃতীয় বললেন, বব্ ওয়াইজ এবার ওদের দেখতে পেয়েছে।

কবি বললেন, স্মৃতি মুছে গেলে একজন অঙ্কের অধ্যাপক হয় জন্তু, আর একটা খুনী ....

ওরা তিনজন এখনো টি ভি'র এক পর্দায় আসে নি। একদিকে আগন্তুক এসে থমকে দাঁড়িয়েছে, মুখটা হাঁ করা, জ্যোৎস্নায় চকচক করছে তার দাঁত।

অন্য দিকে তরুণ আর যুবতী এখন মুখোমুখি। তরুণ যুবতীর জামার বোতামে হাত দিয়েছে, যুবতী খুলছে তরুণের ট্রাউজার্সের জিপার। জামা খোলার পর তরুণ যুবতীর কোমর থেকে ছুরি শুদ্ধু বেল্টটা খুলে মাটিতে রাখলো।

দ্বিতীয়া বাক্সের মতন যন্ত্রটার রেখা ও ফুলকির দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, রক্তে অ্যাড্রিনালিন এসেছে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। হার্ট বীট অনেক বেশী। ব্লাড প্রেসার প্রায় তিনশো। চামড়া আর ভিসেরা থেকে রক্ত এখন চলে যাচ্ছে মাস্‌ল আর ব্রেনে। লোহিত রক্ত কণিকার উৎপাদন বাড়ছে দ্রুত। রোম খাড়া হয়ে উঠেছে, গা থেকে গলগল করে ঘাম বেরুচ্ছে। নিশ্বাস দারুণ জোরে—

মহাশয়া উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বললেন, এসব কী ?

সভাপতি বললেন, খুনীর লক্ষণ ফুটে উঠছে।

—কার ?

—প্রাক্তন অধ্যাপকের।

—ওকে আটকানো যায় না ? আপনারা ব্যবস্থা করুন, শিগগির ওকে আটকান।

—কোনও উপায় নেই।

মহাশয়া দু' হাত মুঠো করে দারুণ কাতর ভাবে বলতে লাগলেন, এখন কী হবে ? হে ভগবান, ওদের বাঁচাও ! ঐ দৈত্যটা ওদের মেরে ফেলবে ! আমার ইচ্ছে করছে, এখানে থেকে চেঁচিয়ে ওদের সাবধান করে দিতে—

মহাশয়া সত্যিই হিস্টিরিয়ার মতন চেঁচিয়ে উঠলেন, না, না, না !

কবি তার পিঠে হাত রাখলেন।

যুবতী তরুণকে বললো, সমুদ্র, তোমার চোখ দুটি ঠিক সমুদ্রের মতন নীল।

তরুণ কিছু বলতে পারলো না, তার আগেই আগন্তুক ছুটে এসে একটা বেড়াল ছানার মতন তাকে তুলে নিল শূন্যে। তরপর আছাড় মারলো মাটিতে।

তরুণ উঠে দাঁড়াবার আগেই আগন্তুক তাকে আবার তুলে নিয়েছে, আঁ আঁ আঁ করে গর্জন করতে করতে সে তাকে আবার আছাড় মারলো খুব জোরে।

ক্রমেই সে খানিকটা দূরে সরে গিয়ে গিয়ে আছাড় মারতে লাগলো তরুণকে। পাঁচ ছ' বার এরকম মারবার পর তরুণের শরীরটা নিঃস্পন্দ হয়ে গেল।

সবাই নিশ্বাস বন্ধ করে দেখছিল। এবারে কবি জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটা মরে গেছে ?

দ্বিতীয়া বললেন, না, এখনো প্রাণে বেঁচে আছে।

যুবতী খাপ থেকে ছুরিটা খুলে ছুটে আসছিল এই আততায়ীকে মারতে, ঠিক শেষ মুহূর্তে সে ঘুরে দাঁড়ালো।

যুবতীর হাত কাঁপছে বিকারের রোগীর মতন। লোকটির গায়ে ছুরির আঘাত করার মতন সাহস সে সঞ্চয় করতে পারছে না। মারবার আগেই লোকটা যদি কোনোক্রমে তার হাত চেপে ধরে ? তা হলেই সে শেষ হয়ে যাবে।

আত্মরক্ষার জন্যই ছুরিটা তুলে ধরে রেখে যুবতী আবার এক পা এক পা করে পেছুতে লাগলো। আগন্তুক যুবতীর মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। আর শব্দ করছে, আঁ-আঁ-আঁ।

কিন্তু ছুরির ভয়াবহতা সে বোঝে। যুবতীকে ধরবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে না, আগে ছুরিটা কেড়ে নেবার জন্য সাবধানে এগোচ্ছে।

তরুণ হাত ও পায়ের ভর দিয়ে উঠে রক্ত বমি করতে লাগলো।

মহাশয়া বললেন, হে ভগবান, ওকে উঠে দাঁড়াবার শক্তি দাও। ওদের বাঁচাও।

কবি শুকনো ভাবে হাঃ হাঃ শব্দে হাসলেন।

তরুণ ঘাড় কাৎ করে যুবতী ও আগন্তুককে দেখলো। মাথাটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে উঠে দাঁড়ালো। তারপর খুব আস্তে আস্তে এগোতে লাগলো ওদের দিকে। থুঃ থুঃ করে মুখ থেকে আরও খানিকটা রক্ত ফেলে দিয়ে সে অতি কষ্টে বললো, জঙ্গল, দাঁড়াও, ওকে মেরো না !

যুবতী তরুণকে দেখতে পেয়েই বললো, বাঁচাও, এর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

আগন্তুক যেই দেখতে পেল যে তরুণ উঠে দাঁড়িয়েছে, অমনি সে আবার ক্রুদ্ধ শব্দ করতে লাগলো ! তরুণের মাথার মধ্যে কুয়াশা, এখনো সে আধো চেতনার মধ্যে রয়েছে। তবু সেই অবস্থায় সে বুঝলো, আগন্তুক আর একবার তাকে ধরতে পারলে সে আর কিছুতেই প্রাণে বাঁচবে না। আগন্তুক তাকে বালির ওপরে আছাড় মেরেছে বলে তার হাড়-পাঁজরা ভাঙেনি, কিন্তু সম্পূর্ণ শরীর অসাড়।

আগন্তুক তার দিকে তেড়ে আসছে বুঝতে পেরে সে কোনোক্রমে দৌড়োতে শুরু করলো আর কাতর ভাবে বলতে লাগলো, জঙ্গল, দাঁড়াও, আমাকে মেরো না, আগে আমার কথা শোনো—।

আগন্তুক তাকে একবার ধরে ফেললেও প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে ছাড়িয়ে তরুণ

ঠিক যেন একটা মাকড়সার মতন ঘুরতে লাগলো চার হাত পায়ে।

কবি বললেন, দেখেছো, মানুষ কী রকম ভাবে বাঁচতে চায়। বাঁচার জন্য কী অদম্য এক শক্তি পেয়ে যায় মানুষ!

মহাশয়া বললেন, ও বাঁচবে, ওকে বাঁচতেই হবে!

আগন্তুক তবু ধরে ফেললো তরুণকে। মাথার ওপরে তুলে ছুঁড়ে দিল অনেক জোরে। কিন্তু এবারে তরুণ সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো।

যুবতী চেঁচিয়ে বললো, আমি তোমাকে ছুরিটা দিচ্ছি। এটা দিয়ে ওকে শেষ করে দাও!

ছুরিটা সে ছুঁড়ে দিল তরুণের দিকে। সেটা মাটিতে এসে পড়লো তরুণের পায়ের কাছে। এই ব্যাপারে একটু অসতর্ক হয়েছিল আগন্তুক, সেই সুযোগে যুবতী ছুটে এলো তরুণের পাশে।

তরুণ ছুরিটা তুলে নিল। তারপর ক্লান্ত ভাবে বললো, এটা দিয়ে আমি এখন কী করবো?

যুবতী বললো, ঐ জন্তুটা, ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও।

আগন্তুক তার কুটিল চোখ দুটি দিয়ে যেন ওদের দু'জনকে এক সঙ্গে পুড়িয়ে দিতে চাইছে।

তরুণ ছুরিটা শক্ত করে ধরে বললো, এখন কি আমি ওকে মেরে ফেলবো? আমি একবার ছুরি বসালেও যদি ও না মরে, তখন আমাকে ধরবে।

আগন্তুক আর এক পা এগোতেই তরুণ বললো, জঙ্গল, তুমি কেন মারতে চাও আমাকে? আমি কি তোমার বন্ধু নই? আমি কি তোমার কোনো ক্ষতি করেছি?

আগন্তুক তার বীভৎস মুখখানা আরও হিংস্র করে তুললো।

যুবতী বললো, ও শুনবে না। ও বুঝবে না। তুমি ওকে মারো, শেষ করে দাও!

তরুন বললেন, তা আমি পারবো না।

যুবতী বললো, না, না, তুমি পারবে। তোমাকে পারতেই হবে।

তরুণ বললো, হয় আমি ওকে মারবো, না হয় ও আমাকে মারবে। আমি এর কোনোটাই চাই না।

—তুমি ওকে মারতে চাও না?

—না। ও তো মানুষ, আমি ওকে মারবো কী করে? মানুষ কি কখনো মানুষকে মারে? মানুষ কি মানুষের খাদ্য? জঙ্গল কী চায় আমি জানি। ও চাইছে আমাদের সমান হতে। তুমি, আমি যতটুকু আনন্দ পাবো, ও তার সমান ভাগ চায়। সেই ভাগ দিলেই ও আর রাগ করবে না। তুমি আমাকে যা দিয়েছো, তা ওকেও দাও!

—অ্যাঁ। কী বলছো তুমি!

—ওকেও আনন্দের ভাগ দাও। ওকে আমাদের সমান করে নাও।

—না, না, আমি পারবো না।

তরুণ যুবতীর একটা হাত চেপে ধরে বললো, ভয় পেয়ে পালিয়ে গেলে চলবে না। তোমাকে পারতেই হবে। তুমি ওকেও আদর করো।

—না, না, আমি মরে যাবো।

—তুমি কেন মরবে? আমরা কেউ মরবো না।

ছুরিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল তরুণ। তারপর যুবতীকে নিয়ে এক পা এক পা করে এগোতে এগোতে খুব মিনতিপূর্ণ গলায় বললো, জঙ্গল, তুমি আমাদের মেরো না। আমরা সবাই সমানভাবে বাঁচবো। তুমি শান্ত হও, ভালো হও। আকাশ যেমন আমাকে ভালোবাসবে, সেই রকম তোমাকেও ভালোবাসবে।

আগন্তুক হয়তো তখনও কিছুই বুঝতে পারছে না, কিন্তু তরুণের ব্যবহার দেখে সে খুবই অবাক হয়েছে। তার মুখে হিংস্রতার বদলে ফুটে উঠেছে সেই ভাবটাই। তরুণ খুব কাছে এসে নির্ভয়ে তার কাঁধে একটা হাত রাখলো।

যুবতী এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল একটুখানি। তারপর নিজের দুই উরুর মধ্যে হাত রেখে দৃঢ় গলায় বললো, না। আমি শুধু তোমার। ও আমায় ছুঁলে আমি মরে যাবো।

তরুণ হুকুমের সুরে বললো, না, আমরা কেউ মরবো না। আমরা সবাই সমানভাবে বাঁচবো। আকাশ, আমি বলছি এসো। তুমি তোমার জিভ দিয়ে ওর বুকটা চেটে দাও। যেমন আমায় দিয়েছিলে। এসো—।

যুবতী তবু একটা মূর্তির মতন দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

তরুণ আগন্তুকের হাত ধরে বললো, চলো। দু'জনে যুবতীর সামনে এলে তরুণ আগন্তুকের সেই হাত ছুঁইয়ে দিল যুবতীর বুকে।

যুবতী তার কান্নাভরা মুখ তুলে বললো, এইরকম ভাবেই কি বাঁচতে হবে?

তরুণ বললো. বেঁচে থাকা খুব সুন্দর। আকাশ, তুমি ওকে জড়িয়ে ধরো, ওর মুখখানা তোমার বুকে নাও। তুমি নিজে থেকে ওকে টেনে নাও।

যুবতী ওকে আলিঙ্গন দিতেই আগন্তুক এমন একটা শব্দ করে উঠলো, যা নিশ্চয়ই কান্নার আওয়াজ। পৃথিবীর হিংস্রতম প্রাণীও কখনো না কখনো নিশ্চয়ই এইভাবে কাঁদে।

সতিই আগন্তুক যুবতীর স্তনে তার চোখ ঘষছে। তোর চোখের জল ভিজিয়ে দিচ্ছে যুবতীকে।

তরুণ বললো, আকাশ, তুমি অমন শক্ত হয়ে থেকো না। ওকে আদর কর, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দাও। ও তোমার কাছে দয়া চাইছে। তুমি ওকে মন দিয়ে গ্রহণ করো।

যুবতী কম্পিত গলায় বললো, তুমি এই কথা বলতে পারছো? তোমার কি হৃদয় নেই?

তরুণ উদাসীন ভাবে বললো, কী জানি! আকাশ, তুমি শুধু আমার হাতে

চেয়েছিলে। আমিও তোমাকে চাই। কিন্তু ...। দ্যাখো, ও এখন আমায় দেখতে পাচ্ছে না, আমি পেছন থেকে ছুরি মেরে ওকে খুন করতে পারি। তারপর সেই রক্ত মাখা হাতে আমি তোমায় ... না, না, তা হয় না! এই ছোট জায়গায় আমাদের এক সঙ্গে সমানভাবে বাঁচতে হবে। হয়তো এক সময় খোকাও তোমাকে চাইবে, তাকেও কি আমি ছুরি মারবো? তুমি যদি কখনো আমার ওপর রেগে যাও, তুমিও কি আমাকে মারবে? না, না, না, মানুষ মানুষকে মারে না। কোনো হাঁস কি অন্য হাঁসকে মেরে ফেলে? কচ্ছপ কি কচ্ছপকে মারে? কোনো কুকুর কি অন্য কুকুরকে খুন করে? আর আমরা মানুষ হয়ে মানুষকে মারবো ... জীবন অনেক সুন্দর ...

তরুণের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

আগন্তুক যুবতীর পাতার পোশাকটা ছিঁড়ে ফেলে এখন মুখ রেখেছে তার উরুর মাঝখানে। এখনও সে কাতর শব্দ করে চলেছে।

যুবতী বললো, সমুদ্র, এরপর তুমি একদিন আমায় একলা একলা সাঁতার শিখিয়ে দিও?

তরুণ বললো, তুমি যা চাও, তোমাকে আমি সব দেবো, আকাশ।

আগন্তুক এবার যুবতীকে শুইয়ে দিল মাটিতে।

যুবতী চেয়ে আছে তরুণের মুখের দিকে, তরুণ হাসলো। তারপর সে আস্তে আস্তে সরে গেল সেখান থেকে।

শ্মশান প্রান্তের সর্বহারার মতন সে নিজের বুকে হাত বুলোতে বুলোতে হাঁটতে লাগলো। তারও চোখ কান্নায় ভরে গেছে এবং তার পুরুষাঙ্গ টনটন করছে।

খানিকদূরে গিয়ে তরুণ সমুদ্রের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। এখান থেকে সমুদ্র দেখতে পাবার কথা নয়। তবু সে দেখলো সমুদ্র থেকে একটা লম্বা সাদা রেখা এগিয়ে আসছে তার দিকে। অন্ধকারে সেই সাদা রেখাটা খুব স্পষ্ট। যেন সেই সাদা রঙের মধ্যে আলো মাখানো আছে।

তরুণের ভুরু কুঁচকে গেল। এ আবার কী? আবার কী উঠে আসছে সমুদ্র থেকে? ঝড় নেই অথচ সে শুনতে পাচ্ছে ঝড়ের মতন সাঁ সাঁ শব্দ।

আর একটু এগোতেই সে শুনতে পেল সমুদ্রের জলের তোলপাড়। সে আরও বুঝতে পারলো, সেই লম্বা সাদা রেখাটা রয়েছে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায়। কিন্তু ঢেউ একবার আসে, একবার পিছিয়ে যায়, এই রেখাটা শুধু এগিয়েই আসছে, ফিরে যাচ্ছে না। যেখানে সে সমুদ্র দেখছে, সেখানে সমুদ্র ছিল না।

সাদা রেখাটা দ্রুত উঠে আসছে ওপরে।

তরুণ খানিকটা পিছিয়ে গিয়ে বললো, আকাশ, আকাশ, সমুদ্র আসছে।

যুবতী উত্তরে বললো, সমুদ্র, সমুদ্র, তুমি এসো। তুমি এসো—।

তরুণ বললো, আমি নয়। সত্যিকারের সমুদ্র উঠে আসছে আমাদের ডুবিয়ে দিতে।

আমাদের ঘর বোধহয় ডুবে গেছে এতক্ষণে। আমি চললুম। তোমরা এসো—।

অন্য টিভির পর্দায় দেখা গেল সমুদ্র অনেক ওপরে উঠে এসে ওদের ঘরের অর্ধেকটা ভাসিয়ে দিয়েছে। ঘুম থেকে উঠে সেই জল দেখেই ভয় পেয়ে খোকা কাঁদতে শুরু করেছে...

সভাপতি নিরাশ হয়ে বললেন, যাঃ! দ্বীপটা বোধহয় এবার ডুবেই যাবে। সর্বনাশ!

মহাশয়া বললেন, তার মানে ...সব শেষ?

ছোট যন্ত্রটার কাছ থেকে উঠে এসেছেন দ্বিতীয়া। তিনি পর্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, ওরা নিজেদের হিংসা জয় করতে পারলো, কিন্তু প্রকৃতির হিংসার হাত থেকে বাঁচবে না। প্রকৃতি এমন নিষ্ঠুর!

সভাপতি বললেন, এই দ্বীপটা কি জলে ডুবে যাওয়ার রেকর্ড আছে আগে?

প্রথম বললেন, তা জানি না। তবে অতটা ভেঙে পড়বার কিছু নেই। জঙ্গলের দিকটা বেশ উঁচু। ওখানে ছোট ছোট পাহাড় আছে। সেখানে আশ্রয় নিলে ওরা বাঁচতে পারবে এখনো।

মহাশয়া বললেন, জঙ্গলে...হিংস্র কুকুরদের সঙ্গে?

—মানুষ তো এক সময় জঙ্গলে, গাছের শাখাতেই থাকতো। ওরা সেখানেই ফিরে যাচ্ছে।

তৃতীয় বললেন, কিন্তু আমি আর একটা কথা ভাবছি। এর পর আরও দু'জনকে পাঠাবার কথা। এই অবস্থায় কি আর কারুকে ঐ জায়গায় পাঠানো উচিত? মানমোশান স্টেশানকে কিছু না জানালে তারা ঠিকই পাঠিয়ে দেবে।

প্রথম বললেন, না পাঠিয়েও বোধহয় উপায় নেই।

মহাশয়া উঠে দাঁড়িয়েছেন। তার মুখের চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম, চোখ দুটি জ্বলজ্বল করছে। তিনি বললেন, ওখানে আরও মানুষ পাঠাবার কথা আছে?

প্রথম বললেন, হ্যাঁ, আরও দু'জন তো বটেই, সম্ভবত তিনজন।

মহাশয়া বললেন, আপনারা বলছিলেন না এই পরীক্ষায় স্বেচ্ছাসেবিকা বা স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাবে না? হ্যাঁ যাবে। আমি যাবো। এর পরে আমাকে পাঠান।

—আপনি কী বলছেন, মহাশয়া?

—আমি ঠিকই বলছি। আপনারা এক্ষুনি আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আমি নিঃশর্তে যেতে চাই, কোনোদিন ফিরে আসতে পারবো না জেনেও।

—না, না, এ হতে পারে না। সে ব্যবস্থা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

—নিশ্চয়ই সম্ভব। কেন আমাকে পাঠাবেন না?

—আপনি হঠাৎ এমন ভাবে...আপনি আরও দু'এক দিন ভাবুন। তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন।

—আমার আর একটুও ভাববার দরকার নেই। এর চেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত আমি জীবনে নিইনি। আমি ঐখানে যাবো।

—আপনার ওপরে কত বড় দায়িত্ব, অতবড় একটা প্রতিষ্ঠান আপনাকে চালাতে হয়, আপনার নিজস্ব সংসার আছে, আপনার স্বামী, দুটি পুত্র—

—আমি ওসব কিছু আর ভাবতে চাই না। আমি ঐ দ্বীপে একটা দিনের জন্য হলেও বাঁচতে চাই। ঐ আকাশ, সমুদ্র, বৃষ্টি আর জঙ্গলের সঙ্গে আমিও থাকবো। আমার নাম হবে মাটি। আপনারা আমার স্মৃতি ভুলিয়ে দিন। আমি আর এই নিষ্ঠুর, হিংসাময় পৃথিবীর কথা মনে রাখতে চাই না। আমাকে ওখানে দিয়ে আসুন।

সকলের সমবেত আপত্তি সত্ত্বেও মহাশয়া উন্মাদিনীর মতন ব্যাকুল ভাবে মিনতি জানাতে লাগলেন। তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন তাঁর ব্যাগ, খুলে ফেলতে গেলেন তাঁর জামা।

সভাপতি তখন বললেন, আপনি শান্ত হোন, মহাশয়া। আপনাকেই আমরা পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।

দ্বিতীয়ার ঠোঁট কাঁপছে। কান্না জড়ানো গলায় তিনি বললেন, সত্যি কথা বলতে কী, আমিও ওখানে যেতে পারলে খুশী হতাম। মহাশয়া, আপনার এই সিদ্ধান্ত নেবার জন্য আপনাকে আমার অভিনন্দন জানাই।

প্রথম ও তৃতীয় মুখ নিচু করে রইলেন।

কবি উঠে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, তাই যাও, মহাশয়া। ওখানে যে কটা দিন বাঁচবে, তুমি শান্তি পাবে। ওখানে রেশারেশি নেই, মানুষের হিংসার নিঃশ্বাস নেই। আহার নিদ্রা মৈথুনের মতন সব কিছুই সরল। মানুষ অনেকদিন এই সরলতা ভুলে গেছে। এর স্বাদ অন্যরকম। তুমি যাও। আমি যাবো না। আমি এই পৃথিবীর দৌড় প্রতিযোগিতা ও রণ-হুঙ্কারের মধ্যেই থাকবো। আমি দেখে যাবো মানুষের মূর্খতা ও ধ্বংসের উল্লাস। আমাকে এই সব কিছু লিখে রেখে যেতে হবে। পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও একজন কেউ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই সব কিছুকে উপহাস করেছিল, এরকম কথা মহাকাল জানবে।

একটু থেমে তিনি বললেন, তবে আমার মনে হয়, হয়তো শেষ পর্যন্ত সব ধ্বংস হবে না। মানুষ যেমন হত্যাকারী, সেইরকম মানুষই পরিত্রাতা। হয়তো আগামী শতাব্দীর মানুষ সবাই এক হয়ে এই পৃথিবীকে জননী হিসেবে প্রণাম জানাবে।

জল ঠেলে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে তরুণ খোকাকে বুকে তুলে নিয়ে বললো, ভয় নেই, ভয় নেই, আমি এসে গেছি। চল, এখান থেকে আমাদের পালাতে হবে।

ঢেউ এসে ধাক্কা মারছে ওদের ঘরের খুঁটিতে। ওদের সামান্য গৃহস্থালীর জিনিসপত্র সব ডুবে গেছে জলে। খোকার সাধ করে জমানো ঝিনুকের রাশি আর শাঁখ আর রঙীন পাথর, কিছুই নেই। খোকা তার জন্য মায়াও করলো না। তরুণ তাকে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।

যুবতী আর আগন্তুকও পৌঁছে গেল সেই সময়। এখনো প্রবল ঢেউ ওঠেনি, তবু ঢেউ উত্তাল। জল আরও বাড়ছে।

তরুণ ওদের বললো, চলো, আমাদের আরও ওপরে যেতে হবে। জঙ্গলের মাঝে পাহাড় আছে। ভয় নেই, আমরা ঠিক বেঁচে যাবো। সবাই সবার হাত ধরে থাকো, নইলে জল টেনে নেবে—।

চারজনে হাত ধরাধরি করে এক সঙ্গে ছুটলো জঙ্গলের দিকে।